www.boiRboi.blogspot.com

চরণ দিলাম রাঙায়ে

www.boiRboi.blogspot.com

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। জনহীন প্রান্তর পার হইয়া আসিতেছে একখানি পাল্কী। চারজন বাহক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পাল্কীর বোল বলিতেছে 'হিঞ্জোরো—বাঁহাবোরা'—ইত্যাদি। আরোহী ভিতর হইতে বলিলেন,

—নামারে, এইখানে রাখ একটু।

বাহকেরা একটা বৃক্ষতলে পাল্কী নামাইয়া বসিল। আরোহী একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়। বাহিরে আসিয়া অস্ত সূর্যের বিদায়লিপির পানে চাহিয়া বলিলেন,

—"তারা—তারা আনন্দময়ী মা—"

বিপরীত দিক হইতে যন্ত্র হস্তে একজন শ্রান্ত পথিক আসিতেছিল, এইখানে আসিয়া থামিয়া গেল।

আরোহী প্রশ্ন করিলেন—কোথায় যাবে হে এই সন্ধ্যাবেলা?

—নূপুরে একটা গানের মজলিস আছে বাবু মশায়।

—পৌছুবে কি ক'রে? সামনে যে অমাবস্যার রাত।

—যেতেই হবে হুজুর, বায়না নিয়েছি পাঁচ টাকা।

—সব শুদ্ধ কত টাকা পাবে?

—দু'দিনে বারো টাকা হুজুর।

—যেতে হবে না, আমার মেয়েকে নাচ গান শেখাবে চলো মাসে কুড়ি টাকা পাবে।

—এমন চাকরী পেলে বেঁচে যাই হুজুর, কিন্তু ওদের যে কথা দিয়েছি, পরশু আমি—

চুলোয় যাক তোমার কথা, টাকা ফিরিয়ে দেবে—চলো, এই ওঠা পাল্কী—

আরোহী যেন পথিককে আদেশই করিয়া পাল্কীতে উঠিতে যাইতেছেন।

—তা কি হয় হুজুর, আমি কথা দিয়েছি, না গেলে ওঁদের সব মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

পথিক নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আরোহী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

www.boiRboi.blogspot.com

—ওদের আবার মান-সম্ভ্রম কি? বারোয়ারীর হরিসভা। ফেরো, ওখানে যাওয়া হবে না।

পথিক একটু থামিল, পরে করজোড়ে বলিল—

—তা হয় না হুজুর, আমার কথা আমাকে রাখতে হবে। পরশু আমি আসবো আপনার বাড়ী!

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল! আরোহী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রইলেন। পথিকের মূর্তি দূরে মিলাইয়া যাইতেই তিনি পাল্কীতে উঠিয়া বসিলেন। বাহকেরা পাল্কী তুলিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বন্দুকের আওয়াজ। বাহকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। আরোহী পাল্কী হইতে বাহির হইবেন কিনা ভাবিতেছেন! অকস্মাৎ অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—হেঁটে যাও হে রামেশ্বর—হেঁটে যাও। মানুষের কাঁধে চ'ড়ে যাওয়ার বড় মানুষী আর করো না হে, আজ থেকে হেঁটে যাও।

—কে তুমি—কে কথা বলছো?

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় এক মূর্তি দেখা গেল।

আমি শ্রীমান রাজীবলোচন অধিকারী। চমকে উঠলে নাকি রামেশ্বর? চিনতে পারছো না?

—নাঃ, চিনবার দরকার নেই, অনর্থক মানুষ খুন করবার চেষ্টা করছো কেন?

—হাঃ হাঃ হাঃ—তুমি আবার খুন-জখমের জন্যে অভিযোগ করছো নাকি হে?

—আমি বিনা কারণে কিছু করিনে!

—কারণ একটা অবশ্য আমারো আছে।—তোমাকে পায়ে হেঁটে বাড়ী পাঠানো। যাক্—শোন, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, যাকে গুলী ক'রে মারবার কারণ ঘটেছিল—আমি যাকে ভালবাসতাম—তার মেয়েটাকে রেখেছ কোথায়? এসো হে—বাইরে এসো, ভয় নাই, তোমায় গুলী করবো না।

—ভয় রামেশ্বর রায় কাউকে করে না। যাক্, সে মেয়ের খোঁজে তোমার দরকার?

রামেশ্বর বাহিরে আসিলেন।

রাজিব বলিলেন—দরকার? ও! আমার দরকার—সে আমারই মেয়ে। আমার মেয়ের খোঁজ করবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে, বিশেষত তার ম যখন জীবন দিয়ে তোমার সঙ্গে তার বিবাহ-ঋণ চুকিয়ে দিয়ে গেছে। শুনলে?

—না, শুনিনি, শুনতে চাইনে, তোমার মত এক শয়তানের হাত থেকে—

—হাঃ হাঃ হাঃ চমৎকার রামেশ্বর! শয়তান তুমি নও তা হলে! ঈশ্বর তোমাকে বুঝি শয়তানেরও বড়ো করে বানিয়েছেন? জয় হোক তাঁর। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

কোথায় সে মেয়ে ?

—বলবো না ; বেশী খোঁজাখুজি কর তো তাকেও তার মার সাথী ক'রে দেব—যাও।

রামেশ্বর হঠাৎ রিভলভার বাহির করিলেন।

রাজীব উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,

—আচ্ছা যাও, হেঁটে যাও হে, হেঁটেই যাও আজ।

রাজীব যেন মুহূর্তে অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন। আকাশের আলো ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল, অন্ধকার হইয়া যাইতেছে শুধু রামেশ্বরের মূর্তিটি আবছা দেখা যাইতেছে। রামেশ্বর সম্মুখের পথ ধরিয়া আস্তে চলিতে লাগিলেন। ডাকাত পড়িয়াছে ভাবিয়া বাহকেরা পলাইয়াছে।

কত কথা আজ মনে পড়িতেছে। কলকাতা সহর। কলেজ-হোষ্টেল। সহপাঠি ক্রীড়া-সঙ্গী, পাঠ্যপুস্তক। বন্ধু—না, বন্ধুত্ব তো কারো সঙ্গে হয় নাই রামেশ্বরের। বন্ধু কোথায় ? শত্রু। পরম শত্রু ঐ রাজিব। বুদ্ধিমান বিদ্বান রাজিবকে তার সঙ্গী করিয়াছিলেন রামেশ্বর ছাত্রজীবনে। কিন্তু কি হইল ? রাজিব তার চোখে ধুলো দিয়াছে—কথাটা কিন্তু সত্য নয়। রাজিবেরই চোখে ধুলো দিয়া জমিদারপুত্র রামেশ্বর ভদ্রাকে আপনার করিয়াছিলেন। না—ঠিক আপনার করা যায় নাই তাকে। জীবন দিল তবু রামেশ্বরের কেউ হইল না। না হোক—রামেশ্বরকে সে একটি অমূল্য রত্ন দিয়া গেছে—তার মেয়ে মীনাক্ষীকে। কিন্তু কিন্তু—এসব কি ভাবিতেছ রামেশর। মীনাক্ষী তো রামেশ্বরের মেয়ে নয়। কেউ-ই নয় সে রামেশ্বরের। না—কেউ নয়।

কিন্তু কেন নয়। তার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে মীনাক্ষী। পূর্বকালে নাকি নিয়োগপ্রথা ছিল ? রামেশ্বর তাই মানিয়া লইবে। মানিয়া লইয়াছে তো। নইলে এতো স্নেহে মীনাক্ষীকে কেন মানুষ করিল রামেশ্বর ?

রামেশ্বরের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সে। সারা বিশ্ব জানে, মীনু রামেশ্বরের কন্যা। তার সর্বস্বের উত্তরাধিকারিণী—কিন্তু রামেশ্বর জানে মীনু তার কেউ নয়—মীনু ঐ রাজিবের কন্যা। তার সর্ব অবয়বে রাজিবের রক্ত—হ্যাঁ—তাই।

নিয়োগপ্রথা। দূর করো। ভাবিয়া সান্ত্বনা পায় না। রামেশ্বরের চোখদুটো অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। বীভৎস রূপ ধারণ করিল শান্ত স্নেহশীল রামেশ্বরের মুখখানা।

রামেশ্বর হাঁটিয়া চলিয়াছেন—হাতের আঙ্গুলে ছয়ঘরা রিভলভারটা নিসপিস করিতেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

গ্রামের সীমানায় আসিতেছেন রামেশ্বর রায়। দূরে প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। প্রাসাদের আলোগুলি নক্ষত্রের ন্যায় দেখাইতেছে কিন্তু রাত্রি অন্ধকার। পথ বাহিয়া রামেশ্বর আসিতেছেন। বলিলেন,

—উঃ—পা দু'টো ভারি হয়ে উঠলো। বহুকাল পথ হাঁটিনি—রাজিব এর মূলে। আচ্ছা, দেখে নেব রাজিব কত বড় শয়তান।

প্রাসাদ হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে।

রামেশ্বর এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। তারপর যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে পা চালাইয়া দিলেন বাড়ীর দিকে।

প্রাসাদের একটি আলোকজ্জ্বল কক্ষে অর্গ্যানের সম্মুখে বসিয়া মীনা গান গাহিতেছে।

গান

প্রজাপতি সাক্ষী আছে ফুলপরীরা এসেছিলো।
সবুজ ঘাসের আসর জুড়ে হাসি তাদের হেসেছিলো।
এসেছিল গোলাপ-কলি পাতার আড়ে মুখ লুকিয়ে,
এসেছিল কেয়াবধূ দীঘল পাতার ঘোমটা দিয়ে,
গন্ধা ঝরা তাদের বুকে ঘুমিয়ে আমি ছিলাম সুখে
অশোকবীথির কচি পাতা আমায় ভাল বেসেছিলো।
জেগে দেখি নাই কোন ফুল, লুটিয়ে কাঁদে সকল লতা,
কে তাহাদের তাড়িয়ে দিল, কে বলেছে নিঠুর কথা।
তরুবীথি বলছে মোরে, ঝরাপাতা বলছে মোরে,
কালো ভ্রমর বলছে মোরে, কেউ কাঁদেনি ওদের তরে,
প্রজাপতি বলছে শুধু বাতাস নাকি শুনেছিলো।

গান তখনো শেষ হয় নাই। রামেশ্বর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। মীনা তাহাকে দেখার পরেও শেষ কলিটা শেষ করিতে করিতে নিকটে আসিল, সস্নেহে হাত দুটি ধরিয়া বলিল—

—বড্ড যে ক্লান্ত দেখাচ্ছে বাবা। বসো বাবা। কপালটা ঘেমে উঠেছে যে।

রামেশ্বরকে কৌচে বসাইয়া দিয়া মীনা আঁচল দিয়া তাঁহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া বলিল,

—আর একটা গান গাইছি বাবা, শোন—

www.boiRboi.blogspot.com

(ছড়া)

বাবা আমার বাড়ী এলো নিয়ে এলো চন্দনা,
আজ কি দিয়ে করবো আমি বাবার চরণ বন্দনা ?
কুন্দ আছে, কেয়া আছে, চাঁপাও ফুটে আছে গাছে,
চুয়াতে আর চন্দনেতে বন্দনা হয় মন্দ না।
কিন্তু আমার মাথার চুলে বাবার চরণ রাখলে তুলে,
হাত বুলোবার সাথে জাগে আনন্দ—না—না···

রামেশ্বর পা টানিয়া লইতেছেন। মীনা গানের শেষের 'না' কথাটায় জোর দিয়া বলিল—

—না—না—না—বাবা, না। মীনা রামেশ্বরের পা চাপিয়া ধরিল, রামেশ্বর মীনার ললাটে স্নেহস্পর্শ বুলাইতে গিয়া একবার থামিয়া গেলেন। পর মুহূর্তে দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মীনার মাথায় হাত রাখিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পা টানিয়া লইলেন। বলিলেন,—

—মায়াবিনী মেয়ে! তোকে দেখি আর মনে হয়—কি যে মনে হয়—ক্লান্ত কণ্ঠে থামিলেন।

—না বাবা, তুমি ওরকম করে কথা বলো না। তুমি যেন মাঝে মাঝে কি রকম হয়ে যাও বাবা, কি যেন স্বপ্ন দেখ! আমাকে বলবে না বাবা ?

বলবো, তোকেই বলবো মীনু! তার আগে তোর চন্দনা নিয়ে আসি। তার হাতে তোকে দিয়ে সব কথাই বলে যাব।

—থাক বাবা, আমি জানতে চাইনে! কি দরকার আমার ? চল, কাপড় ছাড়, হাত-মুখ ধোও, রাত হয়েছে বাবা—ক্ষিদে পেয়েছে যে তোমার।

—না রে, রাত তো বেশী হয়নি।

—আমি বিকেল থেকে কিচ্ছুটি খাইনি বাবা! তোমায় নিয়ে একসঙ্গে খাব বলে বসে আছি। চলো, ওঠো। কানাই! আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। হাত-মুখ ধুয়ে এসো বাবা!

রামেশ্বর চলিয়া গেলেন।

কানাই খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল। রামেশ্বর ও মীনু খাইতে বসিয়াছে।

রামেশ্বর বলিলেন,—তুই এতক্ষণ খেয়ে নিলেই ত পারতিস মা!

মীনু বলিল—তোমার মা থাকলে কি আগে খেতে পারতো বাবা! আমি যে তোমার মা! বাবা, কিছু খাচ্ছো না, রাগ করবো আমি।

—আর পারছি নে মা! পথ হেঁটে ক্ষিদেটা কমে গেছে। আজ আর থাক,

www.boiRboi.blogspot.com

লক্ষ্মী মা আমার, কাল আবার খাবো।

প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের একপার্শ্বে একজন অদ্ভুতদর্শন লোক। অন্ধকারে দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সে পিতাপুত্রীর কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সে নিকটে আসিল, তাহার অবয়ব আধো অন্ধকারে দেখা যায় যেন ছায়া, কিন্তু চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে। বারান্দার এক কোণে আত্মগোপন করিয়া সে রামেশ্বর ও মীনার খাওয়া দেখিতে লাগিল। মীনা বলিতেছে,

—না—না—না, আমি কত কষ্ট করে সন্দেশ তৈরি করলুম আর তুমি খাবে না বাবা? খাও—খেতেই হবে।

রামেশ্বর বলিল, তোর কাছে আমি হেরে গেলুম মা মীনু! মা-দের কাছে খাওয়া সম্বন্ধে ছেলেদের হার চিরকাল। ভীমের খাওয়া দেখে কুন্তীদেবী খুশী হতেন না, কুম্ভকর্ণের খাওয়া দেখে তার মা বলতেন—বাছা আমার কিছু খেতে পারে না। তুই এবার—

মীনু যেন কতকটা নীরস কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, ওভালটিন খেয়ে ঘুমুবে চল, এসো হাত ধুইয়ে দিই।

মীনু রামেশ্বরের হাত ধোয়াইয়া দিল। রামেশ্বর ব্যাকুল স্নেহাতুর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মীনু বলিল—নাও,—এসো, ওভালটিন খাও।

মীনু মুখের কাছে রূপার পেয়ালাটা ধরিল। রামেশ্বর সস্নেহে মীনুকে কাছে টানিয়া বলিলেন—তোর মা যদি আজ থাকতো মীনু—সে যদি আজ থাকতো।

রামেশ্বর উন্মনা হইয়া উঠিলেন। উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কী যে ভাবিতে লাগিলেন—মীনু জানে না। সে অনেকক্ষণ বাবার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল। চিন্তিত বিষণ্ণ মুখ রামেশ্বরের। মীনু কিন্তু আর কিছু বলিল না।

শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। একজন চাকর গড়গড়া রাখিয়া বিছানাটা আর একবার ঝাড়িয়া পাতিল। চতুর্দিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল কোথাও কোন খুঁৎ আছে কিনা। তৎপরে আলোটি কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। শয়নের বেশ পরিধান করিয়া রামেশ্বর আসিয়া শয্যায় শুইলেন ও গড়গড়ার নলটা লইয়া টানিতে লাগিলেন। মীনা আসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—

সেতারটা বাজাই বাবা, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাও। ভারী লক্ষী ছেলে—কেমন?

www.boiRboi.blogspot.com

মীনা সেতার বাজাইতে লাগিল।

রামেশ্বর বলিলেন—তুই শুগে মা, রাত হয়েছে।

মীনা বলিল—তুমি ঘুমাও, তোমাকে একা ফেলে—

—তোর বুড়ো খোকা ঠিক ঘুমুবে, যা শুয়ে পড় মা, রাত বারোটার উপর।

মীনা নিরুপায়ের মত সেতার লইয়া আসিতে আসিতে বলিল,

আধঘণ্টার মধ্যে যেন নাক ডাকার শব্দ পাই বাবা।—

মীনা চলিয়া গেল।

মীনার শয়নকক্ষটি আধুনিক রুচিসম্মতভাবে সাজানো। তবে নানারকম সৌখিন দ্রব্যের একটু বেশি ভীড়। ড্রেসিং টেবিলের নিকট আসিয়া বেশবাস শ্লথ করিয়া দিল সে। প্রকাণ্ড পালঙ্কে সুন্দর শয্যা অপেক্ষা করিতেছে। মীনা দেওয়ালে লম্বিত পিতার মূর্তির পানে চাহিল। ভাবিতে লাগিল।

—মার একটা ফটো পর্যন্ত নাই—আশ্চর্য। মার কথা বাবা কোনদিন কিছু বলেন না, আজ বললেন।

মীনা শুইয়া পড়িল এবং একটা উপন্যাসের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া গেল। ঘরে স্নিগ্ধ আলোক জ্বলিতেছে! দেখা গেল এক অদ্ভুত দর্শন মূর্তি বারান্দা দিয়া নিঃশব্দে মীনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে।

মীনা ঘুমাইতেছে। অতি নিঃশব্দে সেই অদ্ভুতদর্শন লোকটি মীনার শয়নকক্ষে আসিয়া ঔষধসিক্ত একটি রুমাল মীনার মুখে চাপিয়া ধরিল এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যেই তাহাকে অজ্ঞান করিয়া পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

মীনা চলিয়া যাওয়ার পর রামেশ্বর কিছুক্ষণ শুইয়াই ছিলেন। পরে উঠিয়া একটা চাবি লইয়া লৌহ-সিন্দুক খুলিলেন। বহু দিনের বহু বস্তু আছে এই সিন্দুকে। অন্য সব ফেলিয়া দিয়া রামেশ্বর লৌহ-সিন্দুক হইতে একটি ছোট্ট বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের মধ্যে একখানি ফোটো ও এক টুকরো চিঠি। রামেশ্বর ফোটো ও চিঠিখানি কয়েকবার দেখিলেন। শান্ত স্নেহময় রামেশ্বর ধীরে ধীরে যেন পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন। মুখের রেখাগুলি কঠিন হইয়া উঠিল। ওষ্ঠে একটা দারুণ সংকল্প পরিস্ফুট হইল। আপন মনেই বলিলেন—

—রামেশ্বর—ওই মায়াবিনীর শরীরে তোমার এক ফোঁটা রক্ত নেই। তবু ও তোমার কন্যা—তোমার যথাসর্বস্বের অধিকারিণী। কিন্তু রাজীব এতকাল পরে কেন খোঁজ করতে চায়? কেন?—কেন?

কিছুক্ষণ পায়চারি করিলেন, অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন রামেশ্বর। আপনমনে বলিতে লাগিলেন,

www.boiRboi.blogspot.com

না! রায়বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাক। ওকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিই—ওর মার কাছে গিয়ে জুড়োক।

রামেশ্বর একটা ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিলেন। গুলী ভরা আছে কিনা দেখিলেন। আবার সেফের ভিতরকার ফটো ও চিঠিখানি দেখিলেন। ভাবিতেছেন,

—কেন মিছে মমতা বাড়ানো! রাজীব যদি প্রকাশই করে দেয়,—কিন্তু কি স্বার্থে করবে? এতকাল তো কোন খোঁজ করেনি! আজ তার কি দরকার পড়লো!

আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন:

—মেয়ে তার; আমি তার পিতৃত্বকে অন্যায়ভাবে ভোগ করছি! অন্যায়? অন্যায় কি আবার!

যেন চমকিয়া উঠিলেন। কি যেন দেখিতেছেন। দ্বারপ্রান্তে এক অশ্রুমতি নারীর ছায়ামূর্তি—না না ও কিছু নয়।

—কে ও—কে? ওঃ! আবার এসেছ। ভূত আমি মানি না, শুনলে? তোমাদের প্রেম ছিল,—হাঁ, ছিলো প্রেম তোমাদের—স্বর্গীয় সুকুমার প্রেম। তুমি আসতে চাওনি, কিন্তু তোমার বাবা আমাকেই নির্বাচন করেছিলেন। রাজীবকে বার করে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে—মনে পড়ে না? রাজীবের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা তোমার বিয়ের পূর্বেই ঘটেছে জানলে—রায়বংশের বধূ করতাম না তোমায়। যা হবার হয়েছে—এখন ওই মেয়েটাকে শেষ না করলে বংশের মর্যাদা নষ্ট হবে। যতবার সঙ্কল্প করি, তুমি এসে বাধা দাও। আচ্ছা, আজ আর কোন বাধা মানব না। আজ নিশ্চয়ই—

রামেশ্বর মূর্তির পানে রিভলবার উদ্যত করিয়া বলিলেন,

—আগে যাও তুমি—যাও—

রামেশ্বর গুলী করিলেন। মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের উপর বিরক্ত হইয়া একটা বড় আলমারী হইতে বোতল ও গ্লাস বাহির করিলেন—পানীয় ঢালিলেন এবং সামনে বড় ড্রেসিং টেবিলটার নিকট দাঁড়াইয়া পান করিতে লাগিলেন। আয়নায় তাঁহার মুখ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। পুরু পুরু ঠোঁটের উপর ঘন কাঁচা পাকা গোঁফ মুখখানাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। বাঁ হাতে গোঁফজোড়া একবার মুচড়াইয়া লইয়া রামেশ্বর হাসিলেন। নিজের মূর্তির দিকেই চাহিয়া যেন তাহাকে বলিতেছেন—

—কত খুন জখমই তো হয়েছে রামেশ্বর তোমার হাত দিয়ে। এই এক ফোঁটা মেয়েটাকে আজও সরাতে পারলে না! কিসের মায়া-মমতা! কে সে তোমার?

রাজীব আজ যদি প্রকাশ করে, ওর মা বিবাহের পূর্বেই আত্মদান করেছিল, যদি বলে ওর বাপ ওই রাজীব—তা হলে রায়বংশের সম্মান—রামেশ্বর রায়ের অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। রাজীব কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে? কি ওর মতলব?

আরও কয়েকবার মদ্যপান করিলেন এবং ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো নিজের ছবির পানে চাহিয়া রইলেন। অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতেছেন,

—রায়বংশের কেউ থাকবে না—কিন্তু ও তো রায়বংশের কেউ নয়—ওর গায়ে রায়বংশের একটা ফোঁটা রক্ত নেই; অনর্থক বিপদ বাড়ানো—নাঃ—আজই, এই অমাবস্যার রাত—এই অন্ধকার—সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে, এই-ই ঠিক সময়!

রামেশ্বর দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া রিভলবার তুলিয়া লইলেন। অকস্মাৎ বাহিরে কি যেন একটা শব্দ। রামেশ্বর রিভলভার গোপন করিয়া নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন।

কেহ কোথাও নাই।

কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী। সামনে বড় রাস্তা। বাড়ীর ঠিক পাশ দিয়া একটা গলিরাস্তা, সম্মুখে উদ্যান—বাহিরে কলাপ্ সিব্ল্ গেটের পাশে উর্দিপরা তকমাআঁটা দারোয়ান দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ, শুধু বাগানের একদিকে একটা কাচের ঘরের সামনে একটি ক্ষুদ্র জানালা। কাচের ঘরটির মধ্যে কাচের ছোট ছোট জারে নানা জাতীয় সাপ, কয়েকটা হুড়পিতেও সাপ। খাদ্য-দানের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর।

একটি যুবক—পরণে খদ্দরের পাঞ্জাবী, ধুতিখানা কতকটা কাবুলিওয়ালাদের মত করিয়া পরা, হাতে কয়েকখানা চকচকে বাঁধানো বই লইয়া গেটের সামনে আসিল।

দারোয়ান সেলাম করিয়া বলিল,

—আভি তক সাহেব নেহি আয়া হুজুর!

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইল। প্রশ্ন করিল,

—কব্ আয়েঙ্গে কুচ বোলা হ্যায় তোমকো?

—নেহি হুজুর!

যুবক চলিয়া যাইবে কিনা ভাবিতে ভাবিতে কাচের ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নানা রকমে সাপ কিলবিল করিতেছে। যুবকটি শিহরিয়া উঠিল।

যুবক আপন মনে বলিল, লোকে কুকুর-বিড়াল পোষে, না হয়, বাঘ-ভাল্লুক পোষে—উনি পোষেন সাপ! আশ্চর্য খেয়াল কিন্তু!

যুবক চলিয়া যাইতেছে: ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত শোনা গেল। আশ্চর্যান্বিত হইয়া যুবকটি দাঁড়াইল।

www.boiRboi.blogspot.com

গান

আকাশ জাগে আলোর লাগি
বাতাস জাগে ফুলের তরে।
আঁধার রাতের তারা জাগে
আঁধার শেষে ফিরতে ঘরে।
কুঁড়ির ভেতর গন্ধ জাগে,
ব্যাকুল প্রাণে মুক্তি মাগে,
জানি না কে আছে জেগে
আমার বুকের এ পিঞ্জরে।

যুবক দারোয়ানকে শুধাইল,

—কোন হ্যায় দারোয়ানজী! গাওনা করতো হ্যায় কোন্?

তুসরা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর! উধার দরয়াজা হ্যায়।

যুবক আর কিছু জিজ্ঞসা না করিয়া ঘুরিয়া সটান বারান্দায় আসিয়া উঠিল। দরজা বন্ধ। যে দিক হইতে গানের শব্দ আসিতেছে—সেই দিকে—সাপের ঘর যেখানে আছে, সেইখানে গিয়া দেখিল—জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। সে জানে, এ বাড়ীতে প্রফেসার অধিকারী ব্যতীত আর কেহ থাকে না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নিকটবর্তী একটি থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ভিতরে প্রশস্ত একটা কক্ষ। একধারে শুভ্র একটি শয্যা বিছানো রহিয়াছে। কেহ যে তাহাতে শুইয়াছিল—তাহা বোঝা যায়। ঘরের মধ্যে কয়েকটা কাঠের টিপয়ের উপর কয়েকটা কাচের জারে একটা একটা করিয়া জীবন্ত সাপ ফণা তুলিয়া দুলিতেছে। ঘরের একটি কোণায় অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে একটি মেয়ে; ভয়ে কাঁপিতেছে। মধ্যস্থলে একজন বেদে তুমড়ি বাজাইতেছে আর বলিতেছে,

—গাও—আর একবার গাও—

বেদে একটা সাপকে একটু নাড়িয়া দিল।

মীনা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,

—বাবা গো—!

—আর একবার বলো—'বাবা গো—বাবা' বলো।

—তা হলে ছেড়ে দেবে?

—না, তা হলে আচ্ছা বলো—বাবা!

—বলছি। আমি সর্পনৃত্য জানি, নাচবো?

www.boiRboi.blogspot.com

—সত্যি জান ? সত্যি ? নাচ তো মা, নাচ তো ; আমি বাজাচ্ছি। নাচো —ভয় কি ! ওরা আমার পোষা সাপ।

—কিন্তু আমায় ছেড়ে দিতে হবে, বলো—দেবে ?

না। তুমি আমায় বাবা বলবে, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকবো—তুমি শুধু বলবে,—বাবা—বাবাগো—বাবা। যেমন ক'রে সেদিন রামেশ্বর রায়কে বলেছিলে —বলো।

—তোমাকে তেমনি করে বাবা বলতে হবে ! কী আস্পর্ধা তোমার। মীনা রুখিয়া সরিয়া গেল !

—বলবে না ? আচ্ছা !

বেদে একটা সাপকে নাড়িয়া দিল। ভয়ে মীনা করুণ কণ্ঠে বলিল,—বলছি —বাবা।

—নৃত্য কর তো মা, সর্পনৃত্য করো। সাপের নৃত্যে বিষ ঝরে, তোমার নৃত্যে অমৃত ঝরুক।

মীনা বাক্যব্যয় না করিয়া ভয়ে ভয়ে সর্পনৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের সাথে সাথে তালে তালে বাঁশী বাজিতেছে এবং সাপগুলি হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। মীনা বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নৃত্য শেষ হইলে বেদে বলিল,

—রামেশ্বর রায়কে বাবা বলে এতকাল যে বোকামী করেছ মা, আমায় বাবা বলে তার শোধ করো। ও তোমার কেউ নয়। কিন্তু তোমাকে আজ আর কিছু বলবো না। এসো ঘুমুবে।

অত্যন্ত স্নেহের সহিত বেদে মীনুকে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল এবং সাপগুলি যথাস্থানে রাখিয়া সন্তর্পনে একটি বন্ধদ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল।

থামের আড়ালে যে যুবকটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল, সেও অতঃপর ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল এবং বহিঃদরজায় আসিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল,

—উধার কোন্ হ্যায় দারোয়ানজী ?

—দুস্‌রা ভাড়াটিয়া হ্যায় হুজুর। পিছন তরফ উন্‌লোককো ভাড়া দিয়া গিয়া ! ও বেদিয়াকো কোই আপনা আদমী হো গা।

যুবকটি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া রাস্তায় নামিল, আবার থামিল, আবার চলিতে লাগিল ; পুনরায় বাগানের গেটে আসিয়া একটি লতা হইতে ফুল তুলিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল।

ও দিককার গলির মোড় হইতে এক ভদ্রলোক—শুভ্র-সুন্দর ধুতি চাদর পরিহিত, চোখে চশমা, দ্রুত আসিতেছেন, তিনিই প্রফেসার রাজীব অধিকারী।

www.boiRboi.blogspot.com

যুবকের কাছে আসিয়াই থামিয়া বলিলেন,

—চলে যাচ্ছো যে শ্যামল? আমার একটু দেরী হলো। এসো··· শ্যামল তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,

—আজ আর থাকগে স্যার, রাত হয়ে গেল। তা ছাড়া আপনি যেন বড় ক্লান্ত। আমি কাল সকালে আসবো।

—যে নোটগুলো দিয়েছিলুম—বুঝতে পেরেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শুধু এক জায়গায়—

—কাল একবার 'এক্সপেরিমেণ্ট' করে নিও, সবই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—যে আজ্ঞে, আজ তা হলে আসি স্যার!—শ্যামল রাজীবকে প্রণাম করিল।

—এসো বাবা—এসো!

শ্যামলের মূর্তি আধো অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী লেবরেটারী-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড ঘর; এক-পাশ দিয়া দ্বিতলে যাইবার সিঁড়ি দেখা যাইতেছে। ঘরটার চারিদিকেই আলমারি—মেঝেতে কয়েকটা বড় টেবিল পাতা, তাহার উপর মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। আলমারিতে কাচের জারে নানা প্রকার মৃত সর্প কোনটায় বা সাপের কঙ্কাল সংরক্ষিত। একাধারে একটু পর্দা দিয়া পোষাক বদলের স্থান করা আছে। প্রফেসার অধিকারী সেই স্থানে ঢুকিয়া লেবরেটারীর বেশ পরিধান করিলেন। পরে পাইপটা ধরাইয়া লইয়া ঘরের মাঝে রাখা টেবিলের সামনে চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁহার কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,

—খাবার দিয়েছি হুজুর!

—উঁ—কিঃ—?

—খাবার—খাবার দিয়েছি হুজুর!

—আঃ—কি জ্বালাতন করিস। যাঃ—

—খাবার দিয়েছি হুজুর!

রাজীব এতক্ষণে চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন এবং দেখিয়াই কহিলেন,

—শুগে যা খাবো না কিছু।

প্রফেসার অধিকারী পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন। ভৃত্য প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ক্লান্ত প্রফেসার বেশীক্ষণ কার্য করিতে পারিলেন না। কাজ ফেলিয়া উঠিলেন এবং ডাকিলেন—

—ওরে—ও—

ভৃত্য আসিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। প্রফেসার খাদ্য চাহিলেন। ঐ ঘরেই

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁহাকে খাবার দেওয়া হইল—অতি সামান্য খাদ্য। দুই টুকরা রুটি, মাখন, একটু ঝোল এবং কয়েক টুকরো ফল। ভৃত্যকে যাইতে আদেশ করিয়া প্রফেসার খাইতে বসিলেন। কিন্তু আহারে তিনি মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। আলমারি হইতে দুই একটা বই টানিয়া লইয়া যন্ত্রপাতি সহযোগে একাগ্রচিত্তে পুনরায় গবেষণা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ কাজ করিবার পর প্রফেসার অধিকারী অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলেন; কাজে যেন আর মন বসিতেছে না। লেবরেটরীর এক কোণে রক্ষিত ছোট্ট একটি খাঁচার মধ্যে ছোট্ট একটা পাখী আপন মনে শব্দ করিয়া উঠিল। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে উঠিয়া খাঁচাটি সামনে আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া বলিলেন—

—তোর বড় কষ্ট হচ্ছে, না? একলা থাকা অভ্যাস নেই বুঝি? কিন্তু তোকে দিয়ে আমি যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলাম।

পাখীটা কিচমিচ শব্দে আর একবার ডাকিয়া উঠিল।

—ও—এখানে আর থাকবি না—? সঙ্গীর কথা মনে পড়েছে। বেশ—তবে যা—তারি কাছে উড়ে যা, জোর করে আমি তোকে ধরে রাখবো না।

প্রফেসার অধিকারী খাঁচার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পাখীটা উড়াইয়া দিলেন। বনের পাখী মিলনানন্দে পাখা মেলিয়া নীলিমার বুকে মিলাইয়া গেল।

প্রফেসার অধিকারী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উন্মনা দেখাইতেছে; মাথাটা একবার ঝাঁকি দিয়া তিনি দৃষ্টি ফিরাইলেন।

ঘরের এক কোণায় একটি পর্দাঢাকা স্থান। প্রফেসার অধিকারী ধীরে ধীরে গিয়া পর্দাটি তুলিলেন। অপরূপ সুন্দরী একটি নারীমূর্তি দেখা গেল—মূর্তি যেন সজীব, এখনি কথা কহিয়া উঠিবে। প্রফেসার অধিকারী বলিতে লাগিলেন—

—আজো ত তেমনি চেয়ে আছ। তেমনি বিষণ্ণ দৃষ্টি, তেমনি ম্লান। কেন? জানো না—তোমার মীনাকে আজ আমার কোলে ফিরিয়ে এনেছি। চল, দেখবে চল—ভদ্রা! আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিলেন, ঐ নরপিশাচ তোমার মীনাকে ভালবাসার ভণ্ডামী দেখাতো, যেমন করে তোমার বাবার মন জয় করে আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলো;—ভদ্রা।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে আবেগের সহিত বলিলেন—

"তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙ্গিয়া
অয়ি অসীম জীবন বিহারী—
মম হৃদয়রক্ত রঞ্জনে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া…"

প্রঃ অধিকারীর দুই চোখে জল টলমল করিতেছে ; কোথায় কে যেন গুমরিয়া কাঁদিতেছে,—বাবা—বাবাগো—। প্রঃ অধিকারী মূর্তিটির উপর পর্দা টানিয়া দিলেন এবং পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। ঘর অন্ধকার হইয়া গেল।

কলিকাতা সহরের উত্তরদিকে একটা বসতি। কয়েকখানা খোলার ঘর। বাসিন্দারা প্রায় সব শুইয়া পড়িয়াছে। একস্থানে একটা খোলা জায়গায় একজন নর্তকী গাহিতেছে। কয়েকজন শুনিতেছে, মদ ও হল্লা চলিতেছে। শ্যামল পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। আরও কিছু দূরে ছোট্ট একটি ঘর। মা আর ছেলে বাস করে। রাত হইয়া গিয়াছে, ছেলে এখনো বাড়ী ফিরিল না—মা অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আহার্য ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে—কেরোসিনের আলোটা জোর করিয়া দিয়া রামায়ণ লইয়া বসিল। সুর করিয়া পড়িতেছে।

—মা—ওমা।

—যাই বাবা। এত রাত করলি কেন রে!—মা দরজা খুলিয়া দিল।

—খুব একটা জরুরী কাজ ছিল মা। জান তো—তোমায় বললাম সেদিন, বন্যায় আর কলেরায় বাংলা দেশ উজাড় হতে চলেছে। পেটে খাবার নাই, পরনের কাপড় নাই, কী যে তাদের কষ্ট মা।

—তুই তার কী করতে পারিস বাবা! তোরও তো কিছুই নাই।

—আমার আছে মা, শরীরে শক্তি আছে—তোমার মত মা আছে, আরো কত কী আছে। দেখবো যদি কিছু করতে পারি।

শ্যামল হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসিল।

—স্বদেশী নয়তো বাবা? সরকার কিছু বলবে না ত।

—না মা, সরকার খুশী হবে, তোমার ভয় নাই।

মা পুত্রের খাওয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্যামল যেন খানিকটা অন্যমনা হইয়া আছে—ভাল করিয়া খাইতেছে না।

—কিছু যে খাচ্ছিস না—কী ভাবছিস খোকা?

মৃদু হাস্যে শ্যামল বলিল, আজ একটা মজার ব্যাপার দেখে এলুম মা, প্রফেসার অধিকারীর বাড়ীতে, তাই ভাবছি।

—কি এমন মজার ব্যাপার যে খাওয়া ভুলে যেতে হবে।

—প্রফেসার অধিকারী সাপ নিয়ে গবেষণা করেন—জান তো। যে বেদেটা ওঁকে সাপ যোগায়—সে থাকে ওরই বাড়ীর পিছন দিকটায়। আজ দেখলুম ওই বেদেটা কোথা থেকে একটা মেয়ে এনে রেখেছে সেই বাড়ীতে।

www.boiRboi.blogspot.com

—হবে কেউ হয় ত তার—কত বড় মেয়ে ?

—তা পনের, ষোল, সতের, আঠার, উনিশ, কুড়ি হবে।

—সে কিরে, পনের থেকে কুড়ি পর্যন্ত কোন্‌টা বয়স ?

—ওর যে কোন একটা। মেয়েদের বয়স চেনা মুস্কিল মা।

—মজার কি হলো তাতে ?

—শোন। বেদেটা মেয়েটাকে বলছে,—বাবা বলো—বলো আর একবার বলো—বাবা !' ওকে বাবা বলাবার জন্যে বেদের সে কি আগ্রহ মা,—কল্পনাও করতে পারবে না।

—আহা, ওর হয়ত কেউ নাই।

—"বাবা" ডাক শুনবার জন্যে মানুষ অমনি করে মা ? আশ্চর্য নয় ? আমি মা বলে না ডাকলে তুমি অমনি করতে ?

—তা করতাম হয় ত।

শ্যামল অন্যমনে খাইতে লাগিল।

—আচ্ছা মা, একটা কথা বলবো ?

—আগে খেয়ে নে—তারপর কথা।

—খাচ্ছি মা—খাচ্ছি। আচ্ছা মা, ওর না হয় কেউ নেই। তাই একটা মেয়ে ধরে এনে "বাবা" বলাতে চাচ্ছে। আমার বাবার কথা তুমি ত কোনদিনই কিছু বলতে চাও না মা। তিনি কি নেই ?

—না। নেই, বেঁচে থেকেও নেই তার নাম কখনো করিসনে খোকা—ভুলে যা—ভুলে যা তার কথা—

মা অত্যন্ত অসম্বৃতা হইয়া উঠিল।

—ভুলে যাওয়া অত সোজা নয় মা। আমি বেটাছেলে—আমার একটা পিতৃ পরিচয় দরকার। কিন্তু কেন তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছো ? আমাকে বলার কী বাধা আছে মা তোমার ?

—হ্যাঁ—খোকন। মাণিক আমার। সে কথা তুই শুনতে চাস কেন বাবা ! তোর শয়তান, ব্যভিচারী, লম্পট, নারীমাংসলোভী কুক্কুর বাবাকে ভুলে যা খোকন—ভুলে যা, মনে কর এই বিশ্বে মা ছাড়া তোর কেউ নাই।

—সত্যি মা—সত্যি ? সত্যি তিনি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান ? বলো মা, তিনি যা-ই হোন, আমার তো বাবা !

—না-না-না—রাক্ষস। তোর মা'র সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখিরী করে তাড়িয়ে দিয়েছে—নারে না, তুই যখন পৃথিবীর আলোকে আসিসনি, গর্ভে যখন তোর স্পন্দনটুকু মাত্র অনুভব করছি, তখনই একদিন সেই শয়তান একটা মোড়ক

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে বললে—এটা দিয়ে ওকে হত্যা করো—সেইদিনই বুঝেছিলাম—সে কতবড় শয়তান!

—তারপর মা, তারপর?

—তারপর! বুদ্ধি হয়ত ভগবানই যুগিয়ে দিয়েছিলেন, সেইসময় বলেছিলাম, তাই করবো—কিন্তু এ দেশে নয়; কিছু মোটা রকম টাকা দাও—চলে যাই দূর দেশে। টাকা তার আছে; তাই হাজার কতক দিয়েছিলো। সেই রাত্রেই বুড়ী মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাই, তারপর তুই কোলে এসেছিস।

—আমি এমন একজন ভয়ঙ্কর লোকের ছেলে মা!

—কিন্তু তুই দেবতা হয়ে ওঠ খোকা। আমার বুকের রক্ত দিয়ে, আমার অন্তরের সব স্নেহামৃত দিয়ে, আমার ঈশ্বরের সব আশীর্বাদ দিয়ে আমি তোকে দেবতা করে গড়বো—খোকন—বাবা আমার।

—আচ্ছা মা তাই হবে—কিন্তু কোথায় তিনি থাকেন? আমি একবার তাঁকে দেখতে চাই।

—না-না-না—তোর মার বিয়েই হয় নি, তুই তার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান; সে তোকে স্বীকার করবে না। লক্ষ্মী বাবা আমার—চল্, ঘুমোবি চল।

—আজই দেখে এলাম একজন 'বাবা' ডাক শুনবার জন্যে কী আকুল হয়ে প্রার্থনা করছে, আর আমার বাবা—হলুমই বা আমি তোমার অবিবাহিতা অবস্থার সন্তান! তাঁর ঠিকানা?

—না, বলবো না। শুনে তোর কিছু দরকার নেই। চল্—শুবি চল।

মা জোর করিয়া শ্যামলকে টানিয়া লইয়া গেল।

শ্যামল শুইল, কিন্তু চিন্তা তাহার অগাধ হইয়া উঠিতেছে। নিজের পিতৃপরিচয় তাহার জানা নাই। এ পর্যন্ত সে প্রফেসার অধিকারীকেই পিতার মত দেখিয়া আসিয়াছে। যদিও জানে প্রফেসার অধিকারী তাহার পিতা নহেন—পালক-পিতা মাত্র। কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় স্নেহ শ্যামলকে পিতার অভাব জানিতে দেয় নাই।

আজ কিন্তু শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর মধ্যে কিঞ্চিত ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছে। না—স্নেহের অভাব নয়—অন্য কিছু। প্রফেসার অধিকারী যেন কিঞ্চিৎ উন্মনা—কিঞ্চিত উদাস। আজ প্রফেসার অধিকারী তাহাকে না পড়াইয়াই ছাড়িয়া দিলেন—কিন্তু আর কখনো তিনি এমন করেন না। যত রাত্রিই হোক—শ্যামলকে লইয়া তিনি কিছুক্ষণ গবেষণার কার্য চালান। বহুদিনই তাহাকে খাওয়াইয়া ছাড়েন।

শ্যামলের অন্য চিন্তা—কে ওই মেয়েটি! কোথা হইতে আসিল? বেদের মেয়ে সে নয়—নিশ্চয়ই নয়! প্রফেসার অধিকারীর বাড়ীতে অন্য ভাড়াটিয়াও

www.boiRboi.blogspot.com

নাই। বাড়ী ভাড়া দিবার তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই—তবে কে ও!

অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে—এবং যতটুকু কথা তার শ্যামল শুনিয়াছে তাহাতেই বোঝা যায়—মেয়েটি যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সঙ্গীতজ্ঞা। গান সে ভালোই গাহিতে পারে। কে ও।

কিন্তু আজ রাত্রে আর কিছু জানা সম্ভব নহে। মা ওঘরে ঘুমাইতেছেন। শ্যামল মার নিকট তাহার পিতৃপরিচয় কোনদিন জানিতে পারে নাই—আজও পারিল না।

হয়তো প্রফেসার অধিকারী সবই জানেন। কিন্তু তিনিও কোন দিন বলেন নাই। কে জানে কবে শ্যামল তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে পারিবে। আজ শুধু জানিল, তাহার পিতা লম্পট ব্যভিচারী মাতাল। হোক—শ্যামলের মনে অজানা পিতার প্রতি কোনরকম ক্রোধ বা দ্বেষ জাগ্রত হইল না। সে ভাবিল—হয়তো কোন বিশেষ কারণে পিতা তাহার মাতাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। হয়তো কোন পারিবারিক কারণে বিবাহ করিতে পারেন নাই—কিংবা হয়তো—কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে? যে কারণেই হোক—শ্যামল তো তাঁহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। শ্যামলের না-দেখা না-জানা পিতা যেমন হউন—শ্যামল তাহাকে একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে পাইলে যেন ধন্য হইয়া যায়।

আজ সে যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছে—বেদেটা ঐ মেয়েটিকে 'বাবা' বলাইবার জন্য যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে—শ্যামলের পিতা কি ঐ রকম 'বাবা' ডাক শুনিবার জন্য কোন আগ্রহই রাখেন না!

হয়তো তাঁহার আরো সন্তান আছে—যাহাদের 'বাবা' ডাক তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করে। অভাগা শ্যামল জীবনে ঐ মধুর ডাকটি ডাকিতে পাইল না ইহা শুধু দুর্ভাগ্য নহে—প্রকৃতির ইহা নিষ্ঠুর বঞ্চনা।

শ্যামলের অনিদ্রাক্লান্ত চোখে জল গড়াইয়া পড়িল।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রি। মীনু শয্যার উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। তাহার তন্বী দেহলতা ক্রন্দনাবেগে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। অশ্রান্ত ক্রন্দন বাধা মানিতেছে না বেশবাস অত্যন্ত অবিন্যস্ত। কক্ষের স্বল্পালোকে দেহের অবয়ব ভাল দেখা যাইতেছে না। ধীরে ধীরে প্রফেসার অধিকারী আসিয়া দাঁড়াইলেন। মীনুর শয্যালুণ্ঠিত দেহের পানে একবার চাহিলেন—পরে কণ্ঠে অপরূপ স্নেহ মিশাইয়া বলিলেন,

—কাঁদছো কেন মা, মীনু? কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রফেসার অধিকারী আলোটা জোর করিয়া দিলেন। মীনু ত্রস্তে বস্ত্র সংবরণ

www.boiRboi.blogspot.com

করিয়া চাহিয়া দেখিল পরম বিস্ময়ে; প্রফেসারের দিকে আধ মিনিট চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—

—আপনি কে? আপনি—আপনি কত ভালো—কত সুন্দর! কে আপনি?

—আমি—আমি তোমার—যা খুশি তুমি বলো আমায়। বাবা, কাকা, জ্যেঠা, মেসো, বা—একটু থামিয়া আবার বলিলেন—শোবে না মা! রাত হয়েছে যে! ভয় কি তোমার। এ আমার বাড়ী, আমি তোমাকে দেখবো—আমার কাছে থাকবে—মীনু মা!

—আমাকে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দিন—আপনার পায়ে পড়ি। আপনি এতো ভালো—আমায় পৌঁছে দিন।—মীনু প্রফেসার অধিকারীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

—আচ্ছা মা, তাই হবে। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব—ভয় কি—ঘুমাও।

—না—ওই সাপুড়েটা আবার যদি আসে! যদি আবার ওকে বাবা বলতে বলে! ঘুম পাচ্ছে না—ভয় করছে।

না! ও আজ আর আসবে না। আর যদিই বা কাল এসে 'বাবা' বলতে বলে তো একবার না হয় বলবে। "লেট দ্যাট পুওর শোল বি ইওর ফাদার, চাইলড।"

—না—না—না। আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—কিসের জন্য আমি ওকে বাবা বলতে যাবো! কেন আপনি এ রকম বলছেন?

মীনু মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার চোখে আগুন জ্বলিতেছে। প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আচ্ছা, থাক, বলো না। তোমার সত্যিকার বাবাকেই বাবা বলো। এখন ঘুমাও—ঘুমাও মা—চলো—ঘুমোবে।

প্রফেসার অধিকারী তাহাকে টানিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন, আলো কমাইয়া দিলেন এবং কচি ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার মত বলিতে লাগিলেন,

—ঘুমাও মীনু চারদিকে থাক আঁধার বুড়ী জেগে,
কাল সকালে উঠবে সোনার সূর্যকিরণ লেগে।
সেই সকালে আমি যাব আনতে তোমার বর,
তার সঙ্গে মীনু-মানিক—করবে তুমি ঘর।

মীনু কাঁদিতেছে না—হাসিয়া উঠিল। বলিল—

আপনার ছেলে-মেয়ে কেউ নেই?

আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—কোথায় ?

—এই যে! এই এতবড় বাড়ীতে একটি মাত্র মেয়ে আছে, সে তুমি—ছেলে—মেয়ে—সবই,—কিন্তু ঘুমাও মা আমার! তুমি যা চাইবে, তাই দেবো। তোমার বাবার কাছে যেতে চাও—আমি নিয়ে যাবো। ঘুমাও আজ—রাত হয়েছে।

—ঘুমাচ্ছি। ঐ সাপুড়েটা কে? কেন ওকে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেন! ওই কি আমাকে এখানে এনেছে!

—হাঁ তুমি জান না মা, আমি সাপ আর তার বিষ নিয়ে গবেষণা করি। ও আমাকে সাপ এনে দেয়। ওকে না হলে আমার চলে না! আর ও হতভাগারও কেউ কোথাও নাই—তাই তোমাকে মেয়ে করতে সাধ জেগেছে। আচ্ছা—আমি বারণ করে দেবো।

—আমাকে বন্দিনী করে রেখেছে ও!

—না মা! আজ ঘুমাও, কাল আমি তোমাকে নিয়ে সারা সহর বেড়িয়ে আসবো। আমার সঙ্গে সব জায়গায় যাবে তুমি।

প্রফেসার অধিকারী মীনুকে শোয়াইয়া দিলেন!

একটু একটু করিয়া মীনুর চোখের পাতা বুজিয়া গেল। তাহার মাথাটা কোলে লইয়াই প্রফেসার অধিকারী চোখ বুজিলেন। স্নেহের অপার্থিব সুষমায় তাঁর মুখখানা জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিতেছে।

এতো আনন্দ কি জীবনে তিনি কোন দিন পাইয়াছেন? না—আপন আত্মজ দুহিতাকে কোলের কাছে লইয়া ঘুম পাড়াইবার মত সৌভাগ্য তাঁহার তো কোন দিন হয় নাই। অথচ না হইবার মত কিছু ছিল না! সবই ঠিক ছিল—কিন্তু বিধি বিড়ম্বনা।

উদ্দাম যৌবনের জোয়ারে প্রফেসার অধিকারী হয়তো স্খলিত হইয়াছিলেন মুহূর্তের জন্য। কিন্তু মনে তাঁহার কোন পাপবোধ ছিল না। ইংরাজের হাত হইতে দেশ-মাতাকে উদ্ধারের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন প্রফেসার অধিকারী—তাঁহার ছাত্রজীবনে। ভদ্রা ছিল সেই যজ্ঞের হোত্রী। সহকর্মিনী শুধু নয়—সহধর্মিনীর আসনেই তাহাকে বসাইবার সব কথাই পাকা ছিল—কিন্তু অকস্মাৎ রাজরোষে পতিত হইলেন রাজীব অধিকারী। ইংরাজের কারাগারে যাইতে হইল তাঁহাকে। এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। রাজীব সকলই বুঝিয়াছিলেন, ভদ্রার সহিত বিবাহ হইবার মাত্র সাতদিন পূর্বে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইল রামেশ্বরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। রামেশ্বরই তাহাদের গুপ্ত চক্রান্তের কথা ইংরাজ দরবারে জানাইয়া দেয়—কিন্তু আর ও কি করিবে জানা

www.boiRboi.blogspot.com

ছিল না রাজীবের।

কারাগারেই সংবাদ পান—রামেশ্বরে ভদ্রার দরিদ্র পিতাকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়া এবং রাজীব ইংরাজের চক্ষুশূল প্রমাণিত করিয়া ভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছে মীনু তখন মাত্র মাসখানেক ভদ্রার গর্ভে।

এই সেই মীনু! আঠার বছরের হইয়াছে—কিন্তু প্রফেসার অধিকারীর মনে হইতেছে—আঠার দিনের শিশু কন্যা। ঘুমন্ত মীনুর মুখখানা দেখিলেন তিনি—ঠিক ভদ্রার মতই হইয়াছে—হ্যাঁ—প্রায় ওর মার মতই।

কিন্তু প্রফেসার অধিকারী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শান্ত স্নেহশীল মুখ অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিল একটা কথা মনে পড়ায়। এই কথাটাই তিনি জেলের বাহিরে আসিয়া শুনিয়াছিলেন।

ভদ্রার গর্ভে রামেশ্বরের কন্যা জন্মিয়াছে এবং পল্লীগ্রামের আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সর্পের দংশনে ভদ্রার মৃত্যু হইয়াছে। সাপের বিষের ওষুধ পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিক অধিকারী তদবধি সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন।

কিন্তু সেদিন তিনি জানিয়া আসিলেন—সাপের বিষে ভদ্রার মৃত্যু হয় নাই। রামেশ্বর পত্নীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছিল এবং পুলিসের নিকট জানাইয়াছিল—সর্পদংশনে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে।

এই সাংঘাতিক শয়তান রামেশ্বর কন্যা মীনুকেও হত্যা করিত—করিবার চেষ্টা বহুবারই করিয়াছে—কেন করে নাই বা পারে নাই তাহা অজ্ঞাত। হয়তো মীনুর অতি সুন্দর মুখশ্রী—হয়তো বা রামেশ্বরের অন্তরের অন্য কোনরকম অনুভূতি অথবা তাহাকে স্বকন্যা রূপে প্রতিপালিত করিয়া নিজেকে অপত্যবান বলিয়া পরিচিত করার চেষ্টা। কে জানে কি কারণ! তাহা যাই হোক—প্রফেসার অধিকারী দীর্ঘদিন সাপের বিষ লইয়া গবেষণা করিতেছেন। ভদ্রার মৃত্যুর জন্য সাপকেই নিমিত্ত মনে করিয়া তাহা সত্য নহে। সাপ অপেক্ষাও ক্রুর রামেশ্বর রায়ই নিমিত্ত এবং উপাদান, কারণ! ওঃ কি শয়তান!

কিন্তু রামেশ্বর চিরদিনই ভাগ্যবান! আজিও সে ভাগ্যবান আছে। আশ্চর্য বিধাতার নিয়ম! রামেশ্বর এত পাপ করিয়াও ভাগ্যবান—অপত্যবান—আর দুর্ভাগা রাজীব অধিকারী···

না—রাজীব অধিকারী আজ আর দুর্ভাগা নয়। রাজীব চাহিলেন মীনুর ঘুমন্ত মুখ পানে। আহা—কী সুন্দর! ফুলের কুঁড়ির মত দেখাইতেছে মীনুকে। রাজীব আজ আর হতভাগ্য নয়—রাজীব আজ কন্যার পিতা—অপত্যবান রাজীবও আজ। তাঁহার বিপুল খ্যাতি—বিশাল সম্পদ সবই এই মীনুর জন্য থাকিবে—এখন একটা ভাল বর দেখিয়া উহাকে পাত্রস্থা করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু—

www.boiRboi.blogspot.com

লোক সমাজে মীনু রামেশ্বর রায়ের কন্যা। আইনে মীনু রাজীবের কেহই নহে। রামেশ্বর ইচ্ছা করিলে মামলা করিয়া মীনুকে কাড়িয়া লইতে পারে এবং মেয়ে চুরির অপরাধে রাজীবকে জেলেও ভরিতে পারে। হয়তো রামেশ্বর তাহাই করিবে।

জেলে যাইতে ভয় করেন না রাজীব অধিকারী। কিন্তু মীনুকে যদি কাড়িয়া লয় রামেশ্বর! না না—তাহা কিছুতেই রাজীব সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহা অপেক্ষা মীনুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন—বলিবেন, মীনু তাঁহারই কন্যা—কিন্তু মীনু খুব ছোট। সে কি সব কথা বুঝিবে?

প্রফেসার অধিকারী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

সকাল হইয়া গিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারীর লেবরেটরী রুমে ভৃত্য আসিয়া দেখিল—গতরাত্রের খাদ্য সামান্য স্পর্শ করা হইয়াছে মাত্র। সেগুলি তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। একজন চাকর আসিয়া ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিল। দুইজন তরুণী আসিয়া ঢুকিলেন।

প্রফেসার অধিকারী এখনো ওঠেন নি?

—না, কাল অনেক রাত্রে শুয়েছিলেন। বসুন—উঠবেন এখনি। ভৃত্য চলিয়া গেল। তরুণী দুইটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। কাচের জারে মৃত সাপ ও সাপের কঙ্কাল। প্রত্যেকটির নীচে লেবেল মারা আছে—কোন্ দেশের সাপ—বিষাক্ত কিনা—সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ—ইত্যাদি—

তরুণীদের একজন বলিল—

—যদি রাজি না হন ভাই, যা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ!

—না হন চলে যাবো।

শ্যামল আসিয়া ঢুকিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—ভালো আছেন? নমস্কার?

শ্যামল বলিল—আজ্ঞে হাঁ, এত সকালে?

—আজ আমাদের 'সরিৎপদ্মে' একটা জলসা আছে, আপনাকেও নিমন্ত্রণ করছি।

একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র দিল শ্যামলের হাতে।

—ধন্যবাদ। কিন্তু প্রফেসার অধিকারীকে কেন?

—উনি যদি অনুগ্রহ করে প্রিসাইড করেন।

আপনাদের সাহসের প্রশংসা করছি। কিন্তু উনি কি রাজি হবেন মনে করেন?

www.boiRboi.blogspot.com

—জানি না, আপনার কি মনে হয় ?

—জানি না। সাপ নিয়েই যিনি সারাজীবন কাটালেন—বিয়ে পর্যন্ত করলেন না, তাঁর মত লোক এ-ব্যাপারে যাবেন কি না····

নেপথ্যে প্রফেসার অধিকারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ওর স্নানকরা কাপড় ছাড়া ইত্যাদি হ'লে আমাকে খবর দিস। বুঝলি ? বলিতে বলিতে প্রফেসার নামিয়া আসিলেন। দীর্ঘ সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ ; পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সৌম্যশ্রীতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞানের জ্যোতি জাগিয়া আছে। তথাপি মুখে ক্লান্তির চিহ্ন—ওষ্ঠযুগল দৃঢ়তা ও অটুট সংকল্পের পরিচয় দিতেছে। তরুণীদ্বয় নত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া বলিল—

—একটা দরকারে এসেছিলাম, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে স্যার।

—বলো মা, সঙ্কোচের কি আছে ?

—না স্যার—অন্য কথা—

—কারো কাছে ইন্ট্রোডাকৃশন লেটার—

—না স্যার—আমাদের 'সরিৎপদ্মে' আজ একটা জলসা আছে।

—জলসা। সে কি, কি জিনিস ? খাওয়ার নিমন্ত্রণ ?

—হাঁ—নাচ, গান, আবৃত্তি সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ।

—ও—আচ্ছা, তা আমায় কি করতে হবে ?

—আমাদের সব প্রফেসারই একদিন করে প্রিসাইড করেছেন। আজ যদি আপনি অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করেন।

—আমার একটি আত্মীয়া এসেছে—খুব নিকট আত্মীয়া। তাকে নিয়ে যেতে পারবো ?

—নিশ্চয় স্যার—নিশ্চয়। কোথায় তিনি ? আমরা নিজে বলে যাব।

সে নেহাৎ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মা, এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারবে না। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

—বেশ স্যার, তাই করবেন।

আশাতীত সাফল্যে উভয়েই খুব আনন্দিত হইয়া উঠিল। শ্যামল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রফেসার অধিকারী তাহার দিকে চাহিলেন। শ্যামল সকালে উঠিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। হাতমুখ ধোয়া এবং কিছু খাওয়া হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। তাহাকে অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছে।

—তোমার এ-রকম অবস্থা কেন শ্যামল ? খুব যেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। শরীর ভালো আছে ? তোমার মা—?

www.boiRboi.blogspot.com

—ভালই আছি স্যার, একটা দরকারে সকালেই এসেছি।

তরুণীদ্বয় সাহস পাইয়া বলিল—শ্যামলবাবু পড়াশুনো যত ভাল করেন বেশবাসে ততোধিক অন্যমনস্ক। ওঁকেও নিয়ে যাবেন স্যার—আমরা নিমন্ত্রণ করে গেলাম। নমস্কারান্তে তরুণীদ্বয় প্রস্থান করিল।

—বসো শ্যামল। দরকার হয়ত মুখ হাত ধোও বাবা। কিছু খাবে? বোধ হয় না খেয়েই এসেছ!

শ্যামলকে পাশের বাথরুমে যাইতে বলিল,

—হ্যাঁ—খাবো কিছু।

শ্যামল চলিয়া গেলে প্রফেসার অধিকারী বিশেষ কিছুই করিতেছেন না। একটা ফুলের টবে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই একটা তুলিয়া লইলেন। উপর হইতে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, দিদিমণির স্নান হইয়া গিয়াছে। শ্যামল বাহিরে আসিতেই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিলেন। মীনু বারান্দার একধারে দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—

এসো মা, চা খাবে, এসো। এই আমার ছাত্র শ্যামল, এসো, আলাপ করিয়ে দিই।

শ্যামল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছে। গতকল্য সে ইহাকেই তো দেখিয়াছে? হ্যাঁ—ঠিক ইহাকেই। মনে তাহার নানা প্রশ্ন উদয় হইতে লাগিল।

—আপনার সাপ এনে দেয় সেই কে উনি স্যার?

অকস্মাৎ অতর্কিত প্রশ্নে বিব্রত হইয়া প্রফেসার অধিকারীর মুখে বিচলিত ভাব দেখা গেল। মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—

—ওর কেউ নয়, আমারই আত্মীয়া—মেয়ের মত,—বসো।

শ্যামল আর কোন কথা কহিতে সাহস পাইল না। বিশেষ কোন কথাও কহিল না। খাওয়া শেষে প্রফেসার অধিকারী শ্যামলকে লইয়া নীচে নামিলেন। মীনু উপরে রহিল।

* * *

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া আছেন রামেশ্বর। হাতে দোনালা বন্দুক। কোথায় যেন বাহির হইবেন। ভৃত্য কানাই আসিয়া করযোড়ে জানাইল প্রাতরাশ দেওয়া হইয়াছে। বন্দুকটা সযত্নে একপাশে রাখিয়া খাবার-ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্তির স্বরে বলিলেন—

—কি দিয়েছো ওগুলো! মোটা মোট রুটি। রুটিও কাটতে জানো না! মাখন লাগিয়েছো তো ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। নিয়ে যাও!

www.boiRboi.blogspot.com

—ডিম দুটো এতো বেশী সেদ্ধ করেছ কেন? ইডিয়ট সব। হারামজাদার দল—এতকাল কি শিখলি!

খাদ্যপাত্রগুলি ঠেলিয়া দিলেন এবং চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

—চা না ছাই হয়েছে—গরম জলে চিনি গুলে দিয়েছ। যত সব! নীরবে কয়েকটা চুমুক দিয়া বলিলেন—

—ও চেয়ারটা এখানে কেন? সরিয়ে দাও—জান না, ওটাতে মীনু বসতো?—ওটা সরাও! আরও এক চুমুক দিয়া,

—নাঃ—খাওয়া গেল না। উঠিয়া আসিবার পথে ঢাকা দেওয়া সেতারটা দেখিয়া—কি এটা—কি ঢেকে রেখেছ?

দিদিমণির সেতার হুজুর।

রামেশ্বর রায় সেতারে প্রচণ্ড একটা লাথি মারিয়া বলিলেন, দূর করো—আমার চোখের সামনে কেন?

ক্রুদ্ধ বাঘের মত রামেশ্বর বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

'লোকে বলবে—রায় বংশের মেয়ে বেরিয়ে গেল! না বেরিয়ে সে যায় নি। রাজীব তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।' কে আছিস? দয়াল সর্দারকে ডাক—এক্ষুণি।

—ডাকতে গেছে হুজুর।

—গেছে তো আসছে না কেন? লাটসাহেব হয়েছে নাকি?

রামেশ্বর দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। এতবড় স্পর্ধা! আচ্ছা দেখে নেব। দয়াল আসিয়া অভিবাদন করিল!

—এসো দয়াল, এত দেরি করে ফেললে! শুনেছ তো, তোমাদের দিদিরাণীকে, রায় বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। যে তাকে চুরি করেছে আমি চিনিয়ে দেবো—তুমি শেষ করে আসবে, পুরস্কার দক্ষিণের মাঠের বারো বিঘে জোল জমি। তোমার ছেলে—নাতি—ভোগ করবে। রাজি?

—হুজুরের কথা চিরদিন মেনে এসেছি, কিন্তু চুরি সে করেছে কিনা—

রামেশ্বর উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—চুপ কর বেটা, তোকে তার হিসাব রাখতে হবে না।

দয়াল চুপ করিয়া গেল। রামেশ্বর হাঁকিলেন,

—কানাই!

www.boiRboi.blogspot.com

—হুজুর।

—কিছু খেতে দে। ঐ বোতল রয়েছে—একটু কড়া পাক—ঐটে, হ্যাঁ, যা তোরা এবার, আচ্ছা থাম,—না—যা সব।

রামেশ্বর ও দয়াল ব্যতীত অন্য সকলেই চলিয়া গেল।

—মীনুর মার কথা মনে আছে তোমার দয়াল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—মনে থাকবে না কি।

—তাঁরই এক আত্মীয়—হ্যাঁ, আত্মীয়ই বলা যেতে পারে, সেই করেছে এ কাজ। কেন করেছে জান—ভয়ে।

—তা হতে পারে হুজুর, আপনাকে কে না ভয় করে?

—না দয়াল—এই পৃথিবীতে সেই একমাত্র লোক—যে রামেশ্বর রায়কে কোনদিন ভয় করলো না। ভয়ে নয় লোভে—কিন্তু কিসের লোভ জান?

টাকা কড়ি কিছু চায় হয়ত।

—না—না টাকার তার অভাব নাই। যাক—যে জন্যই হোক্ রায় বংশের সম্মান সে ক্ষুণ্ণ করেছে, অতএব—বুঝেছো?

—যে আজ্ঞে, ওর আর বোঝাবুঝি কি! কালই তা হলে।

সম্মুখের পথ দিয়া একজন বৈষ্ণবী গাহিতে গাহিতে আসিতেছে:

গান

সম্মুখের কুঞ্জ-কাননে বসি মনে মনে গাঁথিব যতনে মালা।
আমি প্রভাত-পবনে ভ্রমি বনে বনে জুড়াবো হৃদয়-জ্বালা।
আমার হারানো নিধিরে পাই যদি ফিরে আসিব আবার দেশে,
আর যদি নাহি পাই—শোন বলে যাই কি কাজ ফিরিয়া এসে।
আমি সেই দেশে যাব যেথা গেলে পাব আমার সে হৃদিহারা,
মাটিতে না পাই জলেতে খুঁজিব, হব আকাশের তারা।
আমি বাতাসে বাতাসে মিশিয়া থাকিব সে লবে নিঃশ্বাসে টানি,
আমি জীবনে না পাই মরণে খুঁজিব বিশ্বভুবন খানি।

রামেশ্বর কিছুক্ষণ গান শুনিলেন। এই বিরহসঙ্গীত সহ্য হইতেছে না—, বলিলেন—

ওকে তাড়িয়ে দে তো—তাড়িয়ে দে।

কানাই ও দয়াল যাইবার ইঙ্গিত করিতেই বৈষ্ণবী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কানাইকে বলিলেন—

www.boiRboi.blogspot.com

—ও বেলা কলকাতা যেতে হবে, সুটকেশ, বেডিং, সব গুছিয়ে রাখ। আর ম্যানেজারকে বল কলকাতায় একটা 'তার' করে দিতে।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর বলিলেন—

—আচ্ছা দয়াল, কাল রাত্রেই তোমার দয়াল নাম সার্থক হবে।

রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিলেন।

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দয়াল বলিল—

—হুজুরের দয়া।

দয়াল আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

—রায় বংশের কেউ থাকবে না—না থাক্, যাক—সব যাক।

অত্যন্ত অস্থির হইয়া একটা আয়রন-সেফ খুলিলেন। টানিয়া বাহির করিলেন একটা ফটো ও এক টুকরা কাগজ। জোরে পড়িতে লাগিলেন—

—"প্রিয়, তুমি যে না-দেখা স্বর্গ-কুসুমটি আমাকে উপহার দিয়েছিলে—সে আজ সাতদিন হলো—মাটির ধরণীতে নেমেছে। তোমার অগাধ প্রেমের এই একরত্তি নিদর্শনটুকুই আমার বিশ্ব ভরে রাখবে····রামেশ্বর উচ্চহাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হাঃ হাঃ হাঃ! প্রেম! প্রেম বলে কোন পদার্থ আছে নাকি! ও-সব ওই কাব্যময়ী মেয়ে ভদ্রার ছিলো। যাক, সে গেছে—জাহান্নামে গেছে যদি জানতাম সে বিয়ের পরেও রাজীবের কথাই ভাববে—কিন্তু থাক! সে গেছে! তার মেয়ে যাবে, তার কাছে যাবে রাজীব, যাবেই। বংশের কেউ থাকবে না। দূর হোক—আমি আছি, আমি—স্বয়ং রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

গ্লাসে খাঁটি মদ ঢালিলেন ও মদ্যপান করিতে লাগিলেন।

চিন্তা তাঁর অগাধ হইয়া উঠিল। বহুদিন যে সব কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তাহাও মনে পড়িতেছে—ভদ্রাকে লাভ করিবার জন্য কী ভীষণ চক্রান্ত-জাল তিনি বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু কি হইল? ভদ্রা তাহাকে কিছুই দিল না। না—দিয়াছে অশান্তি! মনে পড়িল, মৃত্যু-মুহূর্তে ভদ্রার কথা—"আমার দেহের দেউলে তিনিই রইলেন—তোমাকে ছুঁতে দিইনি। এই আমার সান্ত্বনা।" আশ্চর্য! মৃত্যু বরণ করিল, তবু সে রামেশ্বরের হইল না। প্রেম কি সত্যই আছে নাকি?

কিন্তু এসব কথা এখন কেন?

চিন্তার মোড় ঘুরাইলেন রায় রামেশ্বর। ভাবিতে লাগিলেন, আগে ভদ্রভাবে বলা যাক—মীনুকে ফিরাইয়া দিতে। অনর্থক ঝামেলা করিতে রামেশ্বর ইচ্ছুক নহেন। মীনুকে তিনি কিছুতেই রাজীবের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারেন না। না—না—না!

www.boiRboi.blogspot.com

রায় বংশের ঐ জ্বলন্ত কলঙ্ক কোন রকমেই পৃথিবীতে থাকিবে না। নিজের হাতে তাহাকে—না—না—না—মীনুকে নিজের হাতে হত্যা করা রামেশ্বরের পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব নহে। মীনু—মীনাক্ষী—তাঁহার কত আদরের মীনাক্ষী—যাহার জন্য রায় রামেশ্বর সর্বস্ব দিতে পারেন—তাহাকে একেবারে হত্যা করিতে হইবে।

কিন্তু উপায় কি। বংশের কলঙ্ক সে। বাঁচিয়া থাকিলে কোনদিন না কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিবে—তাহার জীবনরহস্য। ঐ রাজীবই হয় তো বলিয়া দিবে অথবা ইতিমধ্যেই বলিয়াছে।

কিন্তু হত্যা মীনুকে নিজের হাতে কিছুতেই করিতে পারিবে না রামেশ্বর।—সে কি! কেন? কেন পারিবেন না? কে সে তাঁর। তাঁর নিজের আত্মজ তো···

শিহরিয়া উঠিলেন রায় রামেশ্বর। কোথায় যেন একটা অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে তাঁহার জীবনে। হ্যাঁ—অঘটনই তো!

বহু বহু দিন চলিয়া গিয়াছে—বিশ বৎসর—হয়তো পঁচিশ বৎসর—কে জানে কত দিন—রায় রামেশ্বর একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন—বেশ কিছু টাকা···নাঃ—রায় রামেশ্বরের হইল কি!

চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন—

—এই, কে আছিস!

ভৃত্য কানাই তৎক্ষণাৎ আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন,—কিছু না—যা—

কানাই চলিয়া যাইতেছে। রামেশ্বর বলিলেন—

—আমার বন্দুকটা নিয়ে আয়। না না—থাক—ম্যানেজারকে ডাক! বল, ত্রিশ বছরের হিসাবের খাতা দেখতে চাই আমি।

কানাই চলিয়া গেল। রামেশ্বর মদ ঢালিলেন এবং পান করিলেন। কয়েক মিনিট পরে একটা চাকরের মাথায় কয়েকখানা মোটা খাতা চাপাইয়া ম্যানেজার বলরামবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামেশ্বর তাঁহাকে বলিলেন—

—আমি কোন কোন সালে কলকাতার কলেজে পড়তাম বলরামবাবু?

—হুজুর—বলরামবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—বছর পঁচিশ আগের কথা!

—দেখুন তো ঐ সময় একটা মোটা টাকা আমি খরচ করেছিলাম একসঙ্গে। হাজার আট দশ হবে—কত সালে দেখুন।

বলরামবাবু মনে মনে যতটা সম্ভব সালের হিসাব করিয়া একখানা মোটা খাতা খুলিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলিলেন—

—ইংরাজী উনিশ শো' আটত্রিশ সাল হুজুর—ঠিক পঁচিশ বছর হোল। কত টাকা দেওয়া হয়েছিল···

www.boiRboi.blogspot.com

—থাক—আর কিছু দরকার নাই। যান আপনি।

বলরামবাবু চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন,

তহবিল হইতে মোটা টাকাই লওয়া হইয়াছে—কিন্তু সব টাকা তো ঐ বাবদে খরচ হয় নাই। মীনুর মায়ের বাবাকে কিছু মোটা টাকা দেওয়া হইয়াছিল। বেশী অংশ তিনিই লইয়াছিলেন। মীনুর মা যে তার পূর্বেই রাজীবকে·····না না—এসব কথা রামেশ্বর আর ভাবিবেন না—যত ভাবিতেছেন, ততই তিনি উত্তেজিত হইতেছেন। এখন উত্তেজনার সময় নহে। ধীর মস্তিষ্কে তাঁহাকে সকল দিক সামলাইতে হইবে। আগে রাজীবকে পৃথিবী হইতে সরান দরকার। তারপর—মীনাক্ষীকে। কিন্তু কেন? অকারণ দুটো খুনের কি দরকার। মীনাক্ষীকে সরাইয়া দিলেই তো চলিবে। রাজীব কাঁদিতে থাকিবে—আঁটকুড়ো রাজীব বুকফাটা চীৎকারে কলকাতা সহর কাঁদাইয়া তুলিবে—সেই তো ভাল প্রতিশোধ। রাজীবের আর কেহই থাকিবে না।

কিন্তু রামেশ্বরেরই বা কে থাকিবে! কেহ না—কেহই না। তার পরও কিছুকাল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যাইবে—মন্দ কি? হ্যাঁ—মীনুকেই সাবাড় করিয়া দেওয়া হউক—

—দয়াল!—সজোরে হাঁক দিলেন রামেশ্বর।

—দয়াল তো চলে গেছে হুজুর—কানাই আসিয়া জবাব দিল।

—আচ্ছা থাক্—এখন আর দরকার নেই। তুই যা!

কানাই চলিয়া গেল।

রামেশ্বর ভাবিতেছেন, এত তাড়াতাড়ি কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কলিকাতায় গিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া চিন্তা করিয়া তারপর যা হয় করা যাইবে।

চতুর্দিক শূন্য হইয়া আসিতেছে। বাগানের দিকে একটা মালী ফুলগাছে নিড়ানী চালাইতেছিল—সেও চলিয়া গিয়াছে। রামেশ্বর একা। প্রকাণ্ড ঘরটার মধ্যে একা রামেশ্বর। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই····শুধু আছে রামেশ্বরের চিন্তা—রামেশ্বরের হত্যাপটু হাত এবং সেই হাতে মদের গেলাস।

কিন্তু বিস্তর খাইয়াছেন রামেশ্বর আজ। আর না। রামেশ্বর গ্লাসটা সরাইয়া দিলেন। উঠিয়া একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন দেরাজের কোণা হইতে। বাক্সটির মধ্যে কি যেন আছে। মণিমানিক্য নয়—একটা ফোটো। ছোট একটা বাচ্চার ফোটো। অনাদৃত—অবহেলিত অবস্থার ফোটো। নিতান্ত শিশুর একখানা ফোটো—হয়ত ছয় মাসের। কে জানে কে সে!

কেউ কি জানে? না। কিন্তু রামেশ্বর জানেন? আর কেহ যদি জানে

www.boiRboi.blogspot.com

তো সে রাজীব অধিকারী। হ্যাঁ রাজীবের আর বাঁচা চলে না। রামেশ্বর সম্বন্ধে রাজীব অনেক বেশী জানে—অতএব তাহাকে মরিতেই হইবে।

*　　*　　*　　*

গাড়ীতে চলিতেছিলেন রামেশ্বর রায়—প্রথম শ্রেণীর কামরায় তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ইংরাজ রাজপুরুষ ও বিশেষ ধনী ব্যতীত কেহই চড়িত না।

রায় রামেশ্বর বিশেষ শ্রেণীর ধনী। তাঁহার জমি-জমিদারীতে ও কয়লাকুঠির আয় কয়েক লক্ষ টাকা।

রামেশ্বর রায় গদীমোড়া আসনে শুইলেন। ভৃত্য কানাই চাকরের কামরায় নিজের বিছানা রাখিয়া এখানে আসিল ও মনিবের সবকিছু প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। স্বপ্ন দেখিতেছেন—

জমিদারীর একটা মহলে গিয়াছেন তিনি। প্রকাণ্ড কাছারীর সামনে একটা পুকুর। জল কাক চক্ষুর মত। সেই পুকুরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া মাছ ধরিতেছেন তিনি। ওপাশে গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসে। জমিদার এদিকের ঘাটে আছেন জানিয়া তাহারা কেহই আসিতেছে না। অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে গ্রামের সকলের। কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার মত সাহস নাই।

অবশেষে এক বিধবা আসিয়া করযোড়ে বলিলেন,

—সারা গাঁয়ে এই একটি মাত্র খাবার জলের পুকুর হুজুর····

—হ্যাঁ—তাতে কি? জল খাবে তোমরা!

—হুজুর ঘাটে থাকতে মেয়েরা জল নিতে আসতে পারে না!

—ও তাই নাকি! তা আমাকে তো কেউ জানায় নি। আচ্ছা····

রামেশ্বর ছিপ গুটাইয়া চলিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ ঐ বিধবাকে বলিলেন—

—তুমি কে? কার ঘরের মেয়ে! কে আছে তোমার?

—আমি হুজুর দেবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী। থাকার মধ্যে আছে একটা সোমত্ত মেয়ে।

—চলে কি করে? আয় কি?

—অচল হয়েই আছে হুজুর—আয় তিন বিঘে জমির ধান—আর হাতে পৈতে কাটি।

—তোমার মেয়ে? সে কি করে?

—কী আর করবে হুজুর—রাঁধে-বাড়ে—

—লেখাপড়া শিখেছে?

—সামান্য—গাঁয়ের স্কুলে যা হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

—আচ্ছা—তাকে নিয়ে এসো—আমি দেখি যদি বিয়ে দিয়ে দিতে পারি।

—যে-আজ্ঞে।

বিধবা চলিয়া গেল।

রামেশ্বর কাছারীর ভিতর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন ও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইতেছে। তবে কি আজ উহারা আসিবে না নাকি! না আজ আর আসিবে না। রামেশ্বর একজন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন—

—দেবানন্দ মজুমদারের বাড়ী কতদূর?

—ঐ তো পুকুরটার ওপাশে।

—চল—দেখে আসি। ওদের নাকি খুব অভাব।

হ্যাঁ—হুজুর, চলুন।

জমিদার রামেশ্বর পৌঁছিলেন দেবানন্দ মজুমদারের ভাঙ্গা বাড়ীতে। দরিদ্র বিধবা কি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে। নাই—কিছুই নাই। কিন্তু কিছুই দরকার হইল না। রামেশ্বর নিজেই একটা কাঠের জলচৌকি টানিয়া বসিলেন এবং বলিলেন,

—কৈ—দেখি কত বড় মেয়ে?

ধীরে ধীরে অষ্টাদশী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর দেখিলেন তাহাকে—দেখিলেন মৃৎ প্রদীপের আলোকে—দেখিয়া আর পলক ফেলিলেন না।

—আমিই ওকে বিয়ে করবো। কি নাম তোমার? ভয় কি বলো!

মেয়েটি ভয়ে এবং আশঙ্কায় জড়সড় হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তাহার দিকে তাকাইয়া আবার বলিলেন—

—ভয় কি! রায় বংশের বৌ হবে তুমি।

—অত সৌভাগ্য কি ওর হবে হুজুর!—বিধবা বলিলেন।

—হবে কি—হয়েছে। এ মেয়ে আমি হাতছাড়া করবো না। চল, তোমরা আজ থেকেই আমার কাছারীতে থাকবে। চলে এসো।

—আজ থেকেই? সেটা কি ঠিক হবে হুজুর?

—ও—আচ্ছা—বেশ। আজ অধিবাস হয়ে গেল। কাল বিয়ে। যোগাড় কর। এই নাও টাকা—

রামেশ্বর এক গোছা নোট দিলেন। তাঁহার যেন আর সবুর সহিতেছে না।

—এটা পৌষ মাস চলেছে হুজুর—বিয়ে হয় না।

—ও হ্যাঁ—আচ্ছা, আমি গন্ধর্ব্ব-বিবাহ করবো। শাস্ত্রে-বিধান আছে মালা-

www.boiRboi.blogspot.com

বদল হবে। কালই বিয়ে হবে—বুঝলে

বিধবা চুপ করিয়া রহিলেন। কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে রামেশ্বরের বিরুদ্ধে যাইবে। তিনি মেয়েটিকে আবার দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা—আজ আসি—

কিন্তু তারপর। ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল নাকি। না—একটা ছোট ছেলের ফোটো চোখে ভাসিতেছে।

রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলেন।—হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

বড় রাস্তার উপর 'সরিৎ-সদ্মের' প্রকাণ্ড গেট দেখা যায় পত্রপুষ্প দ্বারা সুন্দর-রূপে সাজানো। ছোট ছোট লাল নীল আলোর ফুলঝুরির মধ্যে সুন্দর হরফে লেখা—"সরিৎ-সদ্ম"। দুই একজন নারী ও পুরুষ ঢুকিতেছেন, কেহ বা বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নীলা ও শীলা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের একজনের হাতে একটি পুষ্পপাত্রে গোড়ে মালা অপরার হাতে একটি বোকে। ওদিক হইতে ইলা একগোছা বেলফুলের মালা লইয়া আসিয়া যোগ দিল। অতিথিদের প্রত্যেককে ইলা একটি করিয়া মালা দিতেছে, পরস্পর অভিবাদন করিয়া অতিথিগণ ভিতরে গিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন। সভাপতি এখনো আসেন নাই। শ্যামল আসিয়া প্রবেশ করিল।

—এই যে শ্যামল বাবু—প্রফেসার অধিকারী কৈ?

—মোটরে আসছেন, আমি বাড়ী থেকে এলাম।

—ভুলে যাননি তো তিনি? আপনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই ভাল হ'তো।

—না—না—কথা দিয়েছেন—আসবেন নিশ্চয়।

একখানি গাড়ী হইতে প্রফেসার অধিকারী নামিলেন। মীনাকে তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিতেছেন। মীনা সাজানো গেট ও লেখাটার দিকে চাহিয়া আছে। হঠাৎ মীনা বলিল,

—সরিৎ মানে তো 'নদী আর 'সদ্ম' মানে বাড়ী, নদীর বাড়ী কি রকম কাকা বাবু?

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—মানে খুঁজো না মা, এটা কলকাতা সহর। এখানে কোন কিছুর মানে নেই। এখানে পঁয়ত্রিশ বছরের মেয়েরা গার্ল, তাদের কাছে তুমি বেবি। 'কাম ডাউন মাই বেবি'। দেখো, হোঁচট লাগে না যেন।

সযত্নে মীনুকে নামাইলেন।

প্রফেসার অধিকারীর গলায় নীলা গোড়ে পরাইয়া দিল। শীলা মীনার হাতে

www.boiRboi.blogspot.com

দিল বোকেটি। ইলা একটি মালা মীনার গলায় পরাইয়া দিল। সকলে হলের মধ্যে প্রবেশ করিলে মীনার হাত ধরিয়া প্রফেসার অধিকারী তাহাকে নিজের ডানদিকের চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

প্রেসিডেন্টের বসার সারিতে কয়েকজন নামকরা ভদ্রলোক—তৎপরে নৃত্যগীতের জন্য স্থান এবং তাহার পর শ্রোতা ও দর্শকের সারি। প্রথমেই এক লাইনে জন পাঁচেক তরুণী ও অন্য লাইনে জন সাতেক তরুণ সমস্বরে গান ধরিল—

গান

"জনগণ মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা"—

গান শেষে একটি মেয়ে আবৃত্তি করিল—

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরা পুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।"

তৎপরে অন্য একটি তরুণ গাহিল—

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস নে আজি দোল।"

অতঃপর দুইটি তরুণ কমিক করিল—

প্রথম জন বলিল—

—বড্ড পয়সার অভাবে পড়েছি রে, গোল্ডফ্লেকের দাম যা চড়া! পাসিংশোই খাচ্ছি আজকাল—কি আর করি! একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুললে হয় না?

দ্বিতীয় জন বলিল—

—ওপথ একদম বন্ধ। বড় বড় সব জাঁদরেলরা নেমেছেন। তবে ভলেন্টিয়ার হতে পারিস।

—দূর—ছোঃ! আচ্ছা এক কাজ করা যাক। ভদ্রভাবে দুটো পয়সা রোজগার করবে—অন্যায় তো করছি না, কি বল।

২য়—আগে মতলবটাই বল, ভদ্র, অভদ্র পরে বোঝা যাবে।

১ম—তুই আর আমি—বুঝলি, আমি আর তুই, হেঁদোকেও নিতে হবে. বেশ লিখতে পারে ছেলেটা—হাঁ—একটা যাত্রার দল—

২য়—তিনজনে যাত্রার দল হয় নাকি রে ইডিয়ট্!

১ম—হ্যাঁ সেদিকেও মেরে রেখেছে। হিন্দু-সংস্কার-সমিতি, অহিন্দু-সংস্কার-সমিতি কতো কি!

১ম—ধরা, একটা সিগারেট ধরা। (সিগারেট ধরাইল) একটা মাসিক পত্র বার করতে হবে মানে বার করবার কসরৎ দেখাতে হবে। সব অশ্লীল—আপাদ-মস্তক অশ্লীল, ন্যাংটা!

২য়—মন্দ মতলব নয়, কিন্তু চালাবি কি দিয়ে? প্রেস, পেপার?

www.boiRboi.blogspot.com

১ম—যারা লিখবে আর যারা পড়বে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে। তোদের বাড়ীর সিঁড়ির পাশে যে জায়গাটা আছে, ওইখানেই অফিস হবে—বুঝেছিস। আমার বাড়ীতে বাবা আছে, তোর ত' আর ঈশ্বরের কৃপায় সে ভয় নেই। দে-না তোর একটা সিগারেট, অনেক দিন উইল্‌স্ খাইনি।

২য়—অফিস করতে বাধা নাই (সিগারেট দিল) কিন্তু টাকা আসবে কি না কে জানে।

১ম—আমি জানি বন্ধু, বাংলার তরুণ-তরুণী এক কলম লিখিবার মত মাসিক-পত্র পেলে আত্মহত্যা করতে পারে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক—চাঁদা এবং ছাঁদা সংগ্রহার্থে।

একজন পরিচিত ভদ্রলোক আসিতেছেন। কর্মিককারীরা বলিল—

১ম—নীরেন দা' যে! শুনুন শুনুন! আমরা একটা মাসিক বার করছি। সব তরুণের লেখা, আর বেবাক অশ্লীল। আপনার সহানুভূতি নিশ্চয় পাব ভেবেই যাচ্ছিলুম।

—তা বেশ, সবই যখন অশ্লীল—তখন আর কথা কি? বার করো!

—চাঁদা বার্ষিক মাত্র দুটো টাকা। আপনারটা—

—সবই যে অশ্লীল হে, টাকা চাইছো কেন? টাকা তো ভয়ানক রকম শ্লীল। ও সব সময় হয় পাস, নয় পকেটে, নয় প্যাঁটরায় লুকিয়ে থাকে, ও দিয়ে কি করবে তোমরা?

দুইজনেই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল—মানে ও দিয়ে অশ্লীল বস্তু সংগ্রহ করতে হয় কিনা। তাই চাইছি।

—ও হো! তাহ'লে টাকাওয়ালাদের কাছে যাও, বলো—ভয়ঙ্কর শ্লীল একটা কিছু বার করছো তোমরা। ভাগবততত্ত্ব, গীতামৃত চণ্ডীসার—এমনি একটা কিছু।

প্রথমজন বলল,—কী চমৎকার বুদ্ধি আপনার নীরেনদা, আসুন না আমাদের দলে।

—আগে কিছু যোগাড় হোক্, তারপর খবর দিও। নীরেন চলিয়া গেল।

ও দেবে চাঁদা, তুইও যেমন। তার চেয়ে গঙ্গার ঘাটে চল—রামায়ণ পড়বো। দু'একটা বুড়ি এক আধ পয়সা দিতে পারে।

—যাঃ! ছ্যাঁচড়ামো করিসনে—ইতর কোথাকার।

একটি তরুণী আসিতেছে। হাতে হ্যাণ্ড ব্যাগ, চোখে চশমা। তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল,—একটু দাঁড়াবেন? একটা কথা ছিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

—বলুন।

—আমরা একটা মাসিক বার করছি—সব তরুণের লেখা—গীতা, ভাগবত, চণ্ডীরসার সংগ্রহ এবং বেবাক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল,—তা বেশ তো, খুব ভাল কথা—দেবেন এককপি পাঠিয়ে। হ্যাণ্ড ব্যাগ হইতে কার্ড বাহির করিয়া দিল—ঠিকানাটা রইলো—আচ্ছা, নমস্কার।

দুজনে পথ আগাইয়া বলিল,—চাঁদাটা যদি আগাম দিতেন তো বড় উপকার হতো—মাত্র দুটো টাকা।

—তা বেশ তো, বিকেলে যাবেন। আমি জুতো কিনতে বেরিয়েছি, নতুন এক জোড়া জুতোর বড্ড দরকার হয়েছে—

—জুতো?

—হ্যাঁ, মানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত। আচ্ছা নমস্কার! তরুণী চলিয়া যাইতেছে।

প্রথমজন বলিল,—মনে রাখবেন, আমাদের শিল্পীসঙ্ঘ সব তরুণ-তরুণী—সব অশ্লীল—বে-আবরু।

অন্যজন তাতে যোগ দিল—

—মানে—নগ্ন, উলঙ্গ, অবাধ—ঠিক আপনার হাতকাটা ব্লাউজের মত।

—না—না, তার চেয়ে আমার জুতো অনেক বে-আব্‌রু—ঠিক আপনাদের মুখের মত।

বলিয়া তরুণী চলিয়া গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

—দে না একটা সিগারেট—দেখছিস না, মনটা কি খিঁচিয়ে দিয়ে গেল!

সিগারেট ধরাইয়া চলিয়া গেল।

কমিকের অভিনয় শেষ হইতেই একটি মেয়ে সুকুমার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিল। পরে "বন্দেমাতরম্" গান হইল। সকলে দাঁড়াইলেন।

প্রফেসার অধিকারী নীরবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখে দু একবার বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াই মিলাইয়া যাইতেছে! মীনা প্রথমটা চুপ করিয়া শুষ্ক মুখেই বসিয়া ছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে নৃত্য ও গীত উপভোগ করিয়া খুশী হইয়া উঠিল। জলসার শেষে প্রফেসার অধিকারী একজন ভদ্রলোককে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রথম ভদ্রলোক বলিলেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ! এই তরুণ শিল্পীসংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত আজকার এই উৎসব আমার মনকে আনন্দের মন্দাকিনী-তীরে নিয়ে গিয়েছে! এঁদের আরো সাফল্য কামনা

www.boiRboi.blogspot.com

করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—এঁরা সকলেই জয়যুক্ত হোন।

অন্য একজন বলিলেন—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমাগত ভদ্রবৃন্দ। এই অপরূপ অনুষ্ঠান-এর উদ্যোক্তারা সকলেই ধন্যবাদার্হ। দেশের তরুণ মন যে ললিত কলা—রস কলা সম্বন্ধে এতখানি সজাগ হয়ে উঠবে, এ আশার এবং আনন্দের কথা। আমি উত্তরোত্তর এদের উন্নতি কামনা করি।

পরবর্তী বক্তা একজন মহিলা। তিনি বলিলেন,

সভাধিষ্ঠাতা ও সভ্যবৃন্দ, আজ কি বিপুল আনন্দ যে পেয়েছি তা মুখে বলবার ভাষা আমার যোগাচ্ছে না। এই কিছুদিন পূর্বে আমরা অতি সামান্য একটা নাচগানে যোগ দিতে পারতাম না। বিয়ের সময় বাসর ঘরের কুৎসিত কদর্য রসিকতা আর খিড়কী পুকুরের জঘন্য আলাপ ছাড়া আমাদের—মেয়েদের আর কোন আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার অধিকার ছিলো না। আজ এখানে যে সব নারী তরুণী নৃত্য গীত আনন্দ নিয়ে আমাদের চিত্তলোকে রস সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা আমাদেরই জাতি—নারীজাতি—তাই নারীজাতির পক্ষ থেকে আমি এর উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

এর পর প্রফেসার অধিকারী উঠিলেন।

—উপস্থিত ভদ্রকন্যা ও ভদ্রলোকগণ। আপনাদের এই অভিনব আনন্দোৎসবের মধ্যে আমাকে যে কেন নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—বুঝতে পারছি না। তথাপি ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এমন একটা ব্যাপার সভ্যরুচিসম্মতভাবে চলতে পারে—এটা দেখবার সুযোগ আমায় আপনারা দিয়েছেন—এই জন্য। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এই আনন্দোৎসব আমাকে নিরানন্দের অন্ধগহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। মানুষের রসগ্রাহী চিত্ত এতে কিভাবে সংক্ষুব্ধ না হয়ে পারে, তাই ভাবছি।

প্রথম যখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল তখন শ্রোতার মন দেশাত্মবোধের উচ্চতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলল; ঠিক তার পরেই একটি আদর্শ প্রেম ও চরিত্রনিষ্ঠার নিদর্শন—এতটা ভালই চললো। তার পরই অতি ললিত গান এবং পরমুহূর্তে বিষাদের এক আবৃত্তি, তৎপরেই আবার বীররস এবং তারপরে লাস্যনৃত্য;—অথচ প্রত্যেকটা আলাদা, কারো সঙ্গে কারো কোন সামঞ্জস্য নেই। মানুষের সূক্ষ্ম কলারস-জ্ঞানকে এমন অদ্ভুত নাগরদোলায় দুলিয়ে হত্যা করবার যাঁরা পক্ষপাতী, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে পারছি না।

আনন্দ উপভোগের নানা পন্থা আছে। মদ বা গাঁজা খেয়েও আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু সে আনন্দ স্বাস্থ্যকর নয়, সুস্থ মন তা কিছুক্ষণ সহ্য করতে পারলেও,

www.boiRboi.blogspot.com

সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানসম্পন্ন মন এতে আহত হয়। তা ছাড়া, এইরকম নানা রসের সমবায়ে যে কলার সৃষ্টি এঁরা করতে চাইছেন, তাতে উচ্চতর কলানুভূতির কোন আবেদন নেই। একটি মহাকাব্যে সব রসই থাকে কিন্তু সবকে আচ্ছন্ন করে থাকে তার পারম্পর্য। আর ঐ যেন টুকরো ছেঁড়া কয়েকটা মৌসুমী ফুলের পাপড়ি, মালা তো হয়ই না—গন্ধও নাই, গোটাফুল দেখারও আনন্দ মেলে না। জাতীয় সঙ্গীতে মন যখন উচ্চগ্রামে বাঁধা ঠিক তার পরেই পারম্পর্য-রহিত প্রেম-সঙ্গীত এবং তারপরই ভাঁড়ামী—কলাজ্ঞানের ব্যভিচার—ইতরামির নামান্তর।

আমাকে এখানে না ডাকলেই সুখী হতাম। যাই হোক, আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি,—এঁরা বারান্তরে সূক্ষ্ম কলা, রসকলার উপযুক্ত ভাবেই আসর গড়বেন।

সভার উদ্যোক্তা শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন—

আমাদের ত্রুটি এমন স্পষ্ট করে কেউ কোন দিন ধরিয়ে দেননি। পূর্বে যাঁরা এসেছেন—সবাই নিছক প্রশংসাই করে গেছেন। প্রফেসার অধিকারী আমাদের যে পরম উপকার করলেন এই স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

সভা ভঙ্গ হইল।

মীনাকে লইয়া প্রফেসার অধিকারী বাহির হইলেন।

রামেশ্বরের কলিকাতার বাটি, প্রকাণ্ড প্রাসাদ; বহির্বাটীও উত্তমরূপে সাজানো। একধারে ফরাস পাতা, অন্যধারে সুদৃশ্য টেবিল এবং তাহার নিকট গদিমোড়া কয়েকখানি চেয়ার। দেওয়ালে একটা সুদৃশ্য সুইজারল্যাণ্ডের ক্লক টাঙানো। টেবিলের উপর টেলিফোন এবং রাইটিং প্যাড—কলমদানী, একটা ভালো ক্যালেণ্ডারের তারিখটা ঠিক করিয়া একজন চেয়ার ও টেবিলগুলি পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ঝাড়িয়া দিল। অন্য একজন একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অপর একজন ভৃত্য একখানা বাংলা ও একখানা ইংরাজী দৈনিক পত্র আনিয়া বাংলাটি ফরাসে ও ইংরাজীটি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। চারজন তরুণ-তরুণী চাঁদার খাতা হাতে প্রবেশ করিল। একজন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কাকে চান?

—বাড়ীর মালিককে।

—কি দরকার?

—সে কথা তাঁকেই বলবো।

—তিনি সবে এসেছেন—নামতে দেরি হবে।

—আচ্ছা, আমরা অপেক্ষা করছি।

দুইজন তরুণ ফরাসে ও দুইজন তরুণী চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ তুলিয়া লইল।

রামেশ্বর রায় আসিতেছেন। ভৃত্যের দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দুই একবার এদিক ওদিক ঘুরিয়া গেল। রামেশ্বর প্রবেশ করিলেন। পরণে মিহি শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে চীনা-ঢঙয়ের হাতকাটা ফতুয়া এবং চাদর, ডান হাতের কনুইয়ের উপর মোটা একটা সোনার তাবিজ এবং পায়ে শুঁড় উঠানো চটিজুতা। তিনি যেন কোথায় বাহির হইবেন। তরুণ-তরুণীগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। রামেশ্বর কিছুটা বিরক্ত কিছুটা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

—কি চাই তোমাদের?

—শুনেছেন নিশ্চয় মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া ঘূর্ণিবাত্যায় উৎসন্ন যেতে বসেছে,—মুর্শিদাবাদে মহামারী আকারে কলেরা····

—হাঁ—তার কলকাতায় কি?

—আমরা আমাদের কলেজ থেকে একটা রিলিফ ওয়ার্ক খুলেছি।

—বেশ; কিন্তু আমি তোমাদের কলেজের মাষ্টারও নই, পড়ুয়াও নই।

—আপনি দেশের একজন মানুষ, আজ আপনার দেশবাসী বিপন্ন—

—তাদের সম্পন্ন হতে বল বাপধনরা, আমি বড় ব্যস্ত আছি। কানাই!····

রামেশ্বর অন্যদিকের চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কানাই আসিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

—সম্পন্ন হবার পূর্বে তারা বাঁচুক, তাদের বাঁচাতে হবে আমাদেরই।

রামেশ্বর মেয়েটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

—কত টাকা উঠেছে?

—বেশী না—শ' দুই, অবশ্য আমরা এই চার পাঁচ দিন কাজ আরম্ভ করেছি।

—কত টাকা সিনেমায় খরচ করলে?

—সে কি স্যার! সিনেমায় খরচ করলুম মানে!

—মানে, কত টাকার সিগারেট খেয়েছ ঐ দুশো টাকার মধ্যে?

—আপনি আমাদের হিসাব পরীক্ষা করতে পারেন।

—আমি অডিটর নই, পরীক্ষার দরকার নেই—কিছু দেবো না। তরুণ-তরুণীগণ পরস্পরের মুখ তাকাইয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। শ্যামল সব পশ্চাতে ছিল—আগাইয়া আসিয়া বলিল—

www.boiRboi.blogspot.com

—কিছু দেবেন না মানে! প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে কত টাকার বাড়ী বানিয়েছেন, কতো টাকার আসবাব কিনেছেন, ট্রেনের কোন ক্লাসে চড়ে কলকাতা এসেছেন, কত টাকার মোটর রাখেন, দৈনিক কত টাকার বাজার হয়, কতগুলো চাকর পোষেন সুখ-সুবিধার জন্যে?

রামেশ্বর অবাক্ হইয়া চাহিয়াছিলেন। বলিলেন,

—কে হে তুমি চমৎকার বলতে পার ত!

—না, এখনো চমৎকার কিছু বলিনি—বলছি কত টাকার মদ কেনা হয়, কত টাকার মেয়ে-মানুষ আছে, ক'জন মোসাহেব আপনাকে চরিয়ে খায়—বলবেন?

—কি বলছো হে তুমি!

—বিশেষ কিছু বলছি না। বাইরে তো দেখে এলুম, ফটকে লেখা রয়েছে "রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়।" হে ইংরাজ সরকারের পোষ্যপুত্র আপনি অবিলম্বে স্যার হোন; কিন্তু যে দেশের মাটিতে জন্মেছেন, যে দেশের বাতাস নিঃশ্বাসে টেনে বেঁচে আছেন, সেই দেশের বৃহৎ একটা অংশ আজ বিপন্ন। নিরন্ন দুর্গতদের এই দারুণ দুঃখের দিনে একবার অন্ততঃ বলুন, আপনার সহানুভূতি আছে। টাকা যদি না-ই দিতে পারেন, ওদেরই কাছ থেকে অপহরণ করা টাকার সবটাই যদি আপনার খোস খেয়ালেই ব্যয় হয়,—কলকাতার এই বিলাসের কেলি-নিকুঞ্জে আপনি যত ইচ্ছা সে টাকা খরচ করুন—অন্যের উপর সন্দেহ করবেন না। সবাই রায় বাহাদুর হতে চায় না, কেউ কেউ আছে—যারা শুধু মানুষই হতে চায়; তাদের যদি চিনতে নাও চান—কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু তারা আছে—তারা থাকবে, চললুম। নমস্কার!

নির্বাক্ বিস্ময়ে রামেশ্বর চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু উহারা চলিয়া যাইতেছে।

—খুব বড় বড় কথা বললে যে হে? কার ছেলে তুমি? বাড়ী কোথায়?

শ্যামল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,

সে খোঁজে আপনার দরকার? আপনার মত স্বার্থান্ধ ধনীর কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিলাম—এটা আমার পিতৃপুরুষগণের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

শ্যামল ও তাহার দল চলিয়া যাইতেছে।

ব্যাকুলভাবে রামেশ্বর বলিলেন,

—ওহে ছোকরা—শোন শোন, টাকা নিয়ে যাও।

যাইতে যাইতে শ্যামলের দল বলিল,

—দরকার হবে না, ও-টাকায় আপনার মোসাহেবদের মদ খাওয়াবেন।

সকলে প্রস্থান করিল।

—ছেলেটা কি আশ্চর্য তুখোড়! আমার মুখের উপর কত কথাই না বলে

গেল! পুঁচকে একটা কলেজের ছেলে, কিন্তু কি অদ্ভুত সাহস ওর!

হ্যাঁ, ছেলের মত একটা ছেলে। কী অবাধে—কতটা অনায়াসে কথাগুলো বললো ও! কে জানে কার ছেলে! ওর বাবা নিশ্চয় ভাগ্যবান। এমনি যদি একটি ছেলে পাই মীনুর জন্য! আহা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী সব ভাবছি! মীনুর ভাবনায় আমার আর কি দরকার! মীনুকে কি আর পৃথিবীতে রাখবো আমি? নিশ্চয় না। রায় বংশের কলঙ্কের ঐ জ্বলন্ত প্রমাণকে পাওয়া মাত্র পৃথিবী থেকে সরাতে হবে।

—এই কে আছিস!

ভৃত্য কানাই আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল। রামেশ্বর দেখিয়া বলিলেন,

—দয়ালকে ডাক—আমার সঙ্গে যেতে হবে, গাড়ী বার করতে বল।

—যে আজ্ঞে!

গাড়ী আসিতেই রামেশ্বর দয়ালকে লইয়া চড়িয়া বসিলেন।

পথে যাইতেছেন রায় রামেশ্বর। সামনের সীটে দয়াল সর্দার ড্রাইভারের পাশে বসিয়া আছে। গাড়ী চলিতেছে রাজীবের বাড়ীর দিকে। রায় রামেশ্বর ভাবিতেছেন কে ঐ ছেলেটি? কী আশ্চর্য তাহার ভাবভঙ্গি। আর চেহারাখানা—সত্যই সুন্দর। সমাজসেবা করিয়া বেড়াইতেছে, কে জানে কে উহাদের সর্দার। কিছু টাকা দিতে পারিলে হয়তো খুশী হইত রায় রামেশ্বর—কিন্তু উহারা তো চটিয়া চলিয়া গেল।

আশ্চর্য! রায় রামেশ্বর কোনদিন তো এসব কথা ভাবেন নাই। কোনদিন কাহাকেও কিছু দান করিয়াছেন কি তিনি? না, মনে পড়িতেছে না। দান তিনি হয়তো করিয়াছেন। কিন্তু সে সবই আজ্ঞাবাহী স্তাবকবৃন্দকে। বন্যার্ত বা মহামারীতে আক্রান্ত কাহাকেও কিছু দিয়াছেন কি? না—দান তিনি কখনো করেন নাই—গ্রহণ করিয়াছেন চিরদিন। যদি দান কিছু করিয়া থাকেন, সাধারণ ভাষায় তাহার নাম ঘুষ।

কিন্তু কেন আজ দানের কথা মনে হইতেছে রামেশ্বরের? কেন—কেন? ঐ বাচ্চা ছেলেটা কয়েকটা শক্ত কথা বলিয়া গেল—তাহারই জন্য কি! হ্যাঁ—অমন জোরালো কথা কেউ কখনো বলে নাই রায় রামেশ্বরকে।

কিন্তু এসব চিন্তার ইহা সময় নহে। গাড়ী রাজীবের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। রায় রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজীবের হাত হইতে মীনুকে উদ্ধার করিতে হইবে। নালিশ করিয়া তাহা করা যাইতে পারে। কিন্তু আদালতে নানা কেলেঙ্কারীর কথা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। তাছাড়া

www.boiRboi.blogspot.com

রায় বংশের কেহ কোনদিন আদালতে যায় নাই। লাঠির জোরই চিরদিন এবংশের সমস্ত মামলা ফয়শালা করিয়াছে। হ্যাঁ—লাঠির জোর—রায় রামেশ্বরের হাতে অন্তত তিন হাজার লাঠিয়াল মজুত। চিন্তা কি?

রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া লইলেন। রাজীবের বার বাড়ীটা দেখা যাইতেছে। প্রকাণ্ড প্রাসাদ—বড় গেট—বাগানে নানা রকম ফুলের গাছ—দরজায় দারোয়ান। রামেশ্বর নিজের বেশবাস সংযত করিয়া লইলেন। গাড়ী আসিয়া গেটে থামিল।

রাজীবের প্রাসাদস্থ লেবরেটারী। রাজীব কোথায় বাহির হইয়াছেন। মীনা একাকিনী আসিয়া ঘরে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাপ ও সাপের কঙ্কালগুলি দেখিতে সে যেন কতকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের মনে হঠাৎ কখন গান ধরিয়াছে।

মীনার গান

আমায় ডাক দিয়েছে বনের কোকিল কুহুর বাঁশীতে।
আমায় লিখলো লিপি ফাগুন-মাহা ফুলের হাসিতে।
আমার মনে যত ছিলো চাওয়া—
সব মিটালো দখিন হাওয়া
সঙ্গোপনে এলো প্রিয় প্রেমের ফাঁসিতে
আমায় বাঁধিয়া নিতে।
অশোক পলাশ ফুলের ডোরে বাঁধিয়া নিতে।

শ্যামল নিঃশব্দে আসিয়া দরজার এক কোণে দাঁড়াইল। মীনা গাহিতেছে। শ্যামল বলিল,

—চমৎকার! বেশ তো গাইতে পারেন।

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া মীনু বলিল,

—যান্—আপনি কখন এসেছেন?

—এই একটুক্ষণ। কিন্তু প্রশংসা করা উচিত হলো না। গানটা থামালেন কেন? গেয়ে চলুন—ভারী সুন্দর লাগছে!

—থাক ঠাট্টা করতে হবে না।

মীনা পাশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়।

—যাবেন না, গান না গাইতে চান, থাক—কথা আছে।

—বলুন। আমার সঙ্গে কি কথা আপনার?

—কিছু মনে করবেন না। প্রফেসার অধিকারীর তো আপনি আত্মীয়া,

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু ঐ বেদেটা কে আপনার ?

—জানি না, ও কেউ নয় আমার ! কেন বলুন ত' ?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি। আজ রাত্রে আমরা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য মেদিনীপুর চলে যাব। প্রফেসার অধিকারীও যাবেন, আপনিও যাবেন আশা করি।

—জানি না, আমায় কিছু বলেন নি।

—হয়তো পরে বলবেন। প্রফেসার অধিকারী এলে বলবেন—আমি এসেছিলাম। আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আসবো। যাবার আয়োজনে ব্যস্ত আছি।

শ্যামল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মীনু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

—ছেলেটা কি সুন্দর দেখতে !

প্রবেশ করিল বেদে। হাতে একটা সাপ।

—কেমন আছিস মা ? কোন কষ্ট হয়নি তো ?

বেদেকে দেখিয়া মীনুর বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। ভয়ে জড়সড় হইয়া সে বলিল—না—ভালো আছি।

—ভয় কী মা—ভয় কী। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। আমাকে যদি বাবা বলতে না পার—বলো না। প্রফেসার অধিকারীর তো আর কেউ নাই, তাকেই বাবা বলো !

—কেন—কিসের জন্য বলবো ! আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর ! খবরদার সাবধানে কথা বলবে।

—ভুল মা—ভুল শুনেছিস তুই। রামেশ্বর রায় তোর শত্রু। তোর মাকে তোর বাবার বুক থেকে ছিঁড়ে কিন্তু থাক মা, তুই বড্ড ছোট। এখন এসব বুঝবি নে।

বেদের কথা শুনিয়া মীনু বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল আধ মিনিট। তারপর ব্যাকুলভাবে বলিল,

—তুমি কি করে এসব জানলে ? কোথায় আমার মা ? তুমি দেখাতে পারো ?

—পারি ! তবে কথা বলাতে পারি না। রামেশ্বর তাকে খুন করেছে, তোকেও খুন করতো—পারেনি।

—মিথ্যে কথা, রামেশ্বর আমার বাবা—আমার বাবা আমায় কতো ভালো-বাসেন। তুমি মিথ্যেবাদী—চোর শয়তান !

www.boiRboi.blogspot.com

—থামো মা, থামো। রামেশ্বরের কাছেই যদি ফিরে যেতে চাও—আমি তোমায় তাঁরই কাছে পৌঁছে দেবো, কিন্তু মীনু তোমার হতভাগ্য পিতা, তোমার সত্যিকার বাবাকে একবার দেখতে চাও না মা? সে যে বড় দুর্ভাগা।

—তোমার কথা সত্যি কি না কি করে জানব! এই সতেরো বছর আমি রায় রামেশ্বরের পিতৃস্নেহে বড় হয়েছি, এক দিনের জন্যও এতটুকু দুঃখ পাইনি—আজ তুমি বলছো তিনি আমার কেউ ন'ন—বরং পরম শত্রু। মিথ্যে কথা।

বেদে অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল,

—শোন মা—ঐ ভণ্ড কাপুরুষ তোর মাকে এক ফোঁটা ভালবাসতে পারে নি। তুই ছোট হলেও বুঝতে পারবি, তোর মা এক হতভাগাকে ভালবাসতো। টাকা কড়ির তার অভাব ছিল না, কিন্তু সে ছিল স্বাধীনতার উপাসক। তাই বারবার বিদেশী রাজদ্বারে হতে হয়েছিল তাকে লাঞ্ছিত। আর সেই সুযোগ নিয়ে রামেশ্বর তার কাঞ্চনকৌলিন্যে তোর মায়ের বাবাকে—তোর দাদুকে বশীভূত ক'রে বিয়ে করেছিলো, তখন তুই গর্ভে মা—তোর চিরদুঃখিনী মা নিরুপায়ের মতো আত্মবলি দিতে পারে নি. নির্মম অত্যাচার সহ্য করেও নিজেকে তার বাঞ্ছিত বন্দী প্রিয়তমের জন্য পবিত্র রেখেছিলো। কিন্তু তোর জন্মাবার পর রামেশ্বর আর সহ্য করতে পারেনি—তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলো—তুই তখন সাত দিনের মাত্র। তোকেও সে সেই সময় সরাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পেরে ওঠেনি, রামেশ্বরের বাবা বাধা হয়েছিলেন। তারপর কতবার যে রামেশ্বর তোকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শেষদিন—যেদিন তোকে চুরি ক'রে এনেছি, সেইদিন তোর বাবা রামেশ্বরের কাছে তোকে চাইতে গিয়েছিলো। তাই সেই রাত্রেই তোকে—অকস্মাৎ বেদে থামিয়া গেল।

—বলো—বলো—এ যদি সত্যি হয়—কোথায় আমার সেই বাবা?—কোথায় তিনি? তুমি কি সেই···?

উত্তেজনায় মীনু কাঁপিতেছে। বেদে শান্ত কণ্ঠে বলিল,

—থাম মা, তুই বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস্!

মীনা পড়িয়া যাইতেছিল—বেদে ধরিয়া ফেলিল।

—না-না-না আপনি বলুন—বলুন আপনি—আপনি কি—

—না মা না! তোর মাকে দেখতে চাস্?

—হাঁ দেখবো আমি—দেখবো—দেখান আপনি!

অকস্মাৎ বাহির হইতে মোটরের শব্দ হইল। বেদে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া দেখিল রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় ও দয়াল সর্দার নামিতেছে। ত্বরিতে মীনুকে টানিয়া লইয়া সে পাশের অন্য দরজা দিয়া চলিয়া গেল। পরক্ষণেই

www.boiRboi.blogspot.com

লেবরেটরীতে রামেশ্বর ও দয়াল প্রবেশ করিলেন। ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

—প্রফেসার অধিকারী কোথায়?

—তিনি বাইরে গেছেন হুজুর।

—কখন ফিরবেন?

—আধঘণ্টার মধ্যে। ভৃত্য পাখাটা চালাইয়া দিল।

লেবরেটারী-ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রামেশ্বর আপন মনে বলিল,—আচ্ছা—আসুক।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

—দয়াল! খুব ভালো করে দেখে রাখো। ঘর, দরজা, ভেতর বার—সব।

—যে আজ্ঞে হুজুর!

উভয়ে কিছুক্ষণ লেবরেটারীতে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঢাকা মূর্তিটার কাছে আসিয়া পর্দা সরাইয়া রামেশ্বর যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

—এ কি?

পরম বিস্ময়ে দয়াল বলিল,

—রাণীমার মুরত হুজুর!

—হাঁ!—পর্দাটা টানিয়া দিলেন।

—তিনি বুঝি রাণীমার কেউ হোন—হুজুর?

—হাঁ—তাঁর আত্মীয়! নইলে মীনুকে চুরি করবে কেন!

রামেশ্বর এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিতেছেন। হঠাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন—স্বদেশী পোষাকপরিহিত জ্যোতির্ময় এক দেশপ্রেমিক।

—ভারত মাতরম বন্দে!

রামেশ্বর পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বললেন—বেশ বেশ। স্বদেশী চালাচ্ছো তা হলে এখনো।

—নিশ্চয়। স্বদেশী করতে গিয়েই তো ভদ্রাকে হারিয়েছি—তাতে ছাড়িনি। কিন্তু অকস্মাৎ রায় বাহাদুরের দীন-ভবনে শুভাগমন কেন?

—মীনুকে রেখেছো কোথায়? চুরি যে তুমি করেছ সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাস্তি। তাকে বার করে দাও, নইলে—

—নালিশ করবে?

—রায়বংশের কেউ কখনো আইন আদালত করে না, জানো ত?

www.BanglaBoi.blogspot.com

—নিজের মেয়েকে আনবার জন্যও আইন-আদালত দরকার হয় না।

—একটা মরা সাপ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেন। বললেন,

—ওরে, রায়বাহাদুর আর তাঁর দেহরক্ষীর জন্যে কিছু চা, জলখাবার আন। কেমন হে—খাবে ত? রামেশ্বর।

—তোমার বাড়ী খেতে আসিনি রাজীব। ভালোয় ভালোয় মীনুকে না দাও—অন্য পন্থা দেখতে হবে। ভেবে বলো।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—দেবো না, যে-কোন পন্থা দেখতে পার।

—না দেবার কারণ? কি অধিকার আছে তোমার তাকে আটক রাখবার?

রাজীব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

—অধিকার তোমারই আছে নাকি হে।

—আচ্ছা—তা হলে দেখা যাক।

দয়াল সর্দার ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল—রামেশ্বর ডাকিলেন,

—এসো দয়াল।

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া রাজীব মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

—শোন রামেশ্বর। তুমি বোধ হয় জানো না যে দীর্ঘ সতেরো বছর আমি সর্বদা মীনুর খোঁজ নিয়েছি। জানতাম তুমি তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখ—সুখে আছে—থাক। কিন্তু সেদিন জানলাম—তুমি তার পিতৃস্নেহবুভুক্ষ হৃদয়কে প্রতারিত করেছো। তুমি তাকে পৃথিবী থেকে —কিন্তু থাক, তুমি বহুদিন তার লালন-পালন করেছো—ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি তার জন্য। এবার আমার ধন আমি ফিরে চাই—তাই নিয়ে এসেছি। ভদ্রার দান—আমার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন কুসুমকলিটি তোমার মত শয়তানের হাতে আর ফেরাবো না।

—ভালোয় ভালোয় দেবে বলেই এসেছিলাম, আচ্ছা থাক—তা হলে।

—কিছু একটু খেয়ে যাও হে রামেশ্বর—বিষ দেবো না, ভয় নেই, বসো। পদ্মার খবর রাখ কিছু?

—কে পদ্মা? কোথাকার পদ্মা?

রাজীব উচ্চহাস্য করিলেন—তা বটে। কোথাকার পদ্মা। নদী হে—কীর্তিনাশা পদ্মা। রায়বংশের সব কীর্তি নাশ করে তবে ছাড়বে। মনে নেই?

—অনর্থক ভয় দেখিও না রাজীব, পদ্মা মেঘনাকে ভয় করে না রামেশ্বর। কে সে—কোথায় থাকে? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার?

www.boiRboi.blogspot.com

—থাক্ থাক্। যখন ভুলেই গেছ—তখন আর কেন, বসো, চা খাও একপাত্র। ওরে—চা-খাবার নিয়ে আয়।

—থাক রাজীব—এই নীরস আতিথ্যের প্রয়োজন নাই। দয়াল!

দয়াল দরজার ওপাশ হইতে বলিল,

—হুজুর!

উভয়ে যাইবার জন্য বাহির হইতেছেন। শ্যামল ঢুকিল।

এক মিনিট তাহার দিকে তাকাইয়া রামেশ্বর বলিলেন,

—এসো দয়াল!

ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে শ্যামল বলিল,

—অধমাধমের আসায় কিছু ক্ষতি হলো নাকি রায়বাহাদুর?

রায় রামেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন। প্রায় আধমিনিট চাহিয়াই রহিলেন তিনি। শ্যামল আবার ব্যঙ্গস্বরে বলিল,

—ভয় দেখাচ্ছেন নাকি স্যার! কিন্তু ও চাহনি বুর্জোয়ার চাহনি। ওতে আমাদের আর কিছু ক্ষতি হয় না।

—সাবধানে কথা বলবে ছোকরা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সাবধানেই আছি। আপনিও এবার থেকে একটু সতর্ক হবেন—কারণ দেশ শীঘ্রি স্বাধীন হচ্ছে—জমিদারী যাবার মুখে; স্যার বা রায় বাহাদুরদের আর খাতির নেই—ওটা ত্যাগ করে বরং খবরের কাগজে নাম ছাপাবেন। বলেন তো আমিই আপনার সে উপকারটা করে দিতে পারি।

—ডেঁপো কাঁহাকা! এসো দয়াল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া রায় রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। রাজীব বলিলেন,

—ব্যাপার কি শ্যামল? ওঁর সঙ্গে কিসের ঝগড়া তোমার? ওঁর অসম্মান করো না। উনি আমার বন্ধু!

—বলবেন না স্যার। উনি আপনার বন্ধু হবার একান্ত অযোগ্য। উনি শুধু শোষক জমিদার নন—উনি শয়তান!

রায় রামেশ্বর গেটের বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিতেছেন। শ্যামল দেখিল, রামেশ্বর চলিয়া গেলেন। রাজীব শ্যামলকে প্রশ্ন করিলেন,

—ওকে তুমি চিন্‌লে কি ক'রে?

—ওঁর বাড়ী চাঁদার জন্য গিয়েছিলাম স্যার। বলেন চাঁদা তুলে কত টাকার সিনেমা দেখলে, কত টাকার সিগারেট খেয়েছ। ও কি জন্যে এখানে এসেছে স্যার? এই দেবভূমি অপবিত্র হবে যে!

www.boiRboi.blogspot.com

রাজীব মৃদুহাস্যে বলিলেন—আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। ও আমার বন্ধু!

—এ পরিচয় দেবেন না স্যার! ও আপনার বন্ধু হবার যোগ্য নয়।

—বন্ধু নয় শ্যামল—শত্রুতা করতেই এসেছিলো। কিন্তু থাক্ সে কথা। মেদিনীপুর যাবার আয়োজন সব হয়েছে ত?

—হ্যাঁ স্যার—সব ঠিক। আজই আমরা রওনা হতে পারি।

—আর দেরী করা উচিত হচ্ছে না, চলো—আজই যাওয়া যাক।

—আপনার সেই আত্মীয়াটিকে কোথায় রেখে যাবেন স্যার?

—ওকে সঙ্গেই নিয়ে যাব, সেও এ সব কাজে যোগ দেবে।

শ্যামল উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল—খুব ভাল হবে স্যার! আচ্ছা, আমি তৈরি হয়ে নিইগে।

রাজীব চুপচাপ বসিয়া আছেন। গভীর চিন্তা করিতেছেন তিনি। শ্যামলের সহিত রায় রামেশ্বরের কথা ও তার প্রতি শ্যামলের মনোভাব জানিলেন প্রফেসর অধিকারী। তিনি নিজেও রামেশ্বরকে শত্রু বলিয়া পরিচিত করিলেন, কিন্তু কেন করিলেন। রামেশ্বর শত্রুতা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে শ্যামলের কি। শ্যামলকে কথাটা বলা ভাল হয় নাই।

কিন্তু শ্যামল তাঁহার ভক্ত শিষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন—হয়তো সে কোনদিন বাংলার গৌরব এমন কি ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারিবে। আগামী দিনের স্বাধীন ভারতে শ্যামলের মত উদার বুদ্ধিমান ও বিদ্বান যুবকের অত্যন্ত প্রয়োজন। শ্যামলকে তিনি নিজ হাতে গড়িয়াছেন—হ্যাঁ গড়িয়াছেন। বহু ব্যক্তির ধারণা—শ্যামল তাঁহারই পুত্র। অন্ততঃ পালিতপুত্র—ইহা সকলেই জানে।

শ্যামল তাহার মাকে লইয়া অন্য বাড়ীতে থাকে। কিন্তু সে বাড়ীর এবং শ্যামল ও তাহার মার দেখাশুনার সব ভারই প্রফেসার অধিকারীর হাতে। কিন্তু প্রফেসার অধিকারী জানেন শ্যামল তাঁহার কেহ নহে—হয়তো কোনদিনই কেহ হইবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন তিনি একটা?

সেই খোলার বস্তিতে শ্যামলের ঘরে টবের উপর একটি তুলসী গাছ। শ্যামলের মা তুলসীমঞ্চতলে প্রণাম করিতেছেন। শ্যামল বাড়ী ঢুকল।

—ভালো ক'রে আশীর্বাদ চেয়ে নাও মা, তোমার খোকা যেন জেলে যায়।

মা চমকিয়া বলিলেন—শয়তান ছেলে! কি অলক্ষুণে কথা—মাগো! খোকা।

www.boiRboi.blogspot.com

হাসিতে হাসিতে শ্যামল বলিল—বন্যায় যারা ডুবেছে, যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, যারা পেটে খাবার আর পরণে কাপড় জোটাতে পারছে না—তাদের জন্য যাচ্ছি মা! তোমার খোকাকে যে দেবতা করতে চাও—ভয় কি তোমার?

—ভয় করে বাবা—মাণিক! আমার যে আর কেউ নেই খোকন!

—আমিই তো আছি মা। প্রফেসার অধিকারী সঙ্গে যাচ্ছেন—তাঁর মেয়েও।

—প্রফেসার অধিকারীর মেয়ে! মেয়ে কোথায় তাঁর?

—ওহো—সেই মেয়েটি—সেই বেদেটা যাকে এনেছে। প্রফেসার অধিকারীর আত্মীয়া—মেয়ে ঠিক নয়—ভুল হয়েছে মা! তবে মেয়ে বললে বিশেষ দোষ হয় না। যাই হোক আজ আমাদের যেতে হবে মা।

—যেতে হয়—আসবি গিয়ে বাবা! তবু মনকে বোঝাতে পারি না।

—বোঝাও মা! মাত্র আট দশটা দিন মনকে বোঝাও একটু। চলো, খেতে দেবে। মা শ্যামলকে খাইতে দিল। খাইতে খাইতে শ্যামল বলিল, আর একটা কথা আছে মা!

—বল মাণিক।

—"শ্যামল।" বাহির হইতে ডাকিয়া প্রফেসার অধিকারী প্রবেশ করিলেন।

শশব্যস্তে শ্যামল বলিল—আসুন স্যার—আসুন।

—খেয়ে নাও—আমি বসছি। মীনু মা।

পিছনে মীনা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া শ্যামলের মা বলিল,

—বাঃ, কি সুন্দর মেয়েটি। কে আপনার?

প্রফেসার অধিকারী সহাস্যে বলিলেন,

—আমার গত জন্মের মেয়ে।

শ্যামলের মা মীনাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী একটা মোড়া টানিয়া বসিলেন। শ্যামল বারান্দায় খাইতে বসিয়াছে।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—আজ রওনা না হলে বিশেষ অসুবিধা ঘটতে পারে যাওয়ার পক্ষে তাই ভেবে আজই যেতে হচ্ছে শ্যামল। আশা করি তোমার অসুবিধা হবে না।

—কিছু না স্যার। আমি সব সময়েই তৈরি।

এই তো বীরের লক্ষণ শ্যামল। সব সময়েই সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকো। জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে, যার জন্য মানুষ মোটে প্রস্তুত থাকে না। বীর যে তার প্রস্তুতি চিরদিন।

—আপনার শিক্ষা যেন সার্থক করতে পারি স্যার।

www.boiRboi.blogspot.com

মীনা ও মা ফিরিয়া আসিল।

ওকে কিছু খাওয়াতে পারছি না যে?

—ও খেয়ে এসেছে, তা ছাড়া আরো খাবার সঙ্গে আছে। থাক, ফিরে এসে খাবে আপনার কাছে।

—প্রথম দিন এলো—আজ কিছু খাবে না?

প্রফেসার অধিকারী মীনাকে বলিলেন,

—যা মা—উনি মায়ের মত, খা কিছু।

—আচ্ছা, দিন। এই শ্যামলবাবুর পাতের-সন্দেশটা খেয়েই জল খাই একটু।

মীনা শ্যামলের ভুক্তাবশিষ্ট সন্দেশ লইয়া মুখে দিল।

—আমার এঁটো খেলেন?

—হ্যাঁ—কেন? কি হয়েছে তাতে?

—আমার জাতকুল কিছু ঠিক নেই; জানেন না তো।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,

—আছে শ্যামল, সব ঠিক আছে। তুমি মানুষ জাত, তোমার কুল সভ্যভদ্র শিক্ষিত কুল, এঁটো খেলে ওর জাত যাবে না।

মা সস্নেহে মীনার দিকে চাহিয়া বলিল,

—ফিরে আসুন আপনারা, ওকে আমি দু'দিন কাছে রাখবো।

—বেশ, সেই দু'দিন শ্যামল আমার কাছে থাকবে।

শ্যামল ও মীনা বাক্স বিছানা বাহিরে গাড়ীতে উঠাইল।

—আসি মা, উনি সঙ্গে রইলেন—ভয় কি তোমার।

না বাবা—ভয় করছি না, তবু বলি সাবধানে থাকিস।

শ্যামল, মীনা ও প্রফেসার অধিকারী চলিয়া গেলেন।

—এতটুকু ছেলে—কত বড় হয়েছে। কত ওর সাহস। দুর্জয় ওর সঙ্কল্প। সেই বাপেরই তো ছেলে! গোঁ যা ধরবে, ছাড়বে না।

মা আপন মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—এই মেয়েটি কে? প্রফেসার অধিকারী সম্পর্কটা চেপে গেলেন। হবে হয়তো কেউ মা-বাপ মরা। অনাথের বন্ধু প্রফেসার অধিকারী, নইলে আমিই তো ভেসে যেতাম কোথায়!

তুলসীতলায় আর একবার প্রণাম করিয়া বাহিরে দেখিতে লাগিল। অন্ধকার নামিতেছে।

* * *

বস্তির স্বল্পালোকিত পথে দেখা গেল রামেশ্বর ও দয়ালকে।

—দেখেছিস? চিনতে পারবি তো?

www.boiRboi.blogspot.com

— হ্যাঁ হুজুর, কিন্তু ওঁরা যে ঢাকা মোটরে যাচ্ছেন।

—তাতে তোর কি উল্লুক! চল্, এই, ট্যাক্সি—ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিটা থামিল না। রামেশ্বর ও দয়াল দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে দয়াল বলিল,

—কলকাতায় বেশি সুবিধে ছিলো হুজুর!

—ছিলো, কিন্তু তা যখন হলোই না তখন অন্য পন্থা দেখতে হবে। চল্ এখুনি ট্রেন ধরতে হবে।

—চলুন হুজুর!

একখানা ট্যাক্সি চাই-ই, কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না। দরকারের সময়ই ওদের পাওয়া যায় না। কিন্তু রামেশ্বর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি হাঁটিয়াই চলিতেছেন। সঙ্গে স্যুটকেশ ও বিছানার বাণ্ডিল মাথায় দয়াল। অবশেষে ট্যাক্সি একখানা মিলিল। গলদঘর্ম কলেবরে ষ্টেশনে আসিয়া রায় রামেশ্বর দুইখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিলেন। রাজীব থার্ড ক্লাসে যাইবে। কারণ তাহাদের জন্য একখানা থার্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ আছে। দয়াল যদি থার্ড ক্লাসের দিকে যায় তো রাজীব বা মীনু তাহাকে চিনিয়া ফেলিতে পারে। তাই দয়ালকেও তিনি প্রথম শ্রেণীতেই রাখিলেন। দয়াল এমন গদীমোড়া গাড়ীতে কখনো বসে নাই। রামেশ্বর গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন,

—ওকে পৃথিবী থেকে সরাতেই হবে দয়াল—ভগবানও ওকে বাঁচাতে পারবে না।

—নিশ্চয় হুজুর—নিশ্চয়! কোথায় আর যাবে। মেদিনীপুরও আমার দেখা আছে হুজুর—কাঁথির ওদিকটায় ছিলাম কিছুদিন।

—তাই নাকি! তবে তো মহাসুবিধে। কাঁথিই যাচ্ছে ওরা, কিন্তু কি ভাবে কাজ হাসিল করবে?

—সে ভাবনা এখন নয় হুজুর। ওখানে যেমন সুবিধে পাব, তেমনি করা যাবে। কি বলেন?

—ঠিক ঠিক—তোমার হাতিয়ার সব কোথায়?

—ছোরা? ও ঠিক আছে হুজুর—ও ছাড়া আমি চলি না।

—বাঃ! এই তো চাই।

—কিন্তু দিদিমণিকে একেবারে খুন কি করে করবো হুজুর!

—কেন? মায়া জাগছে নাকি তোমার?

—তা হুজুর—মায়া-দয়া আমাদের নাই হুজুর, তবে দিদিমণি মা-মরা—মুখখানি দেখলেই রাণীমাকে মনে পড়ে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

রামেশ্বর দুই মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,

—ও সব ছাড় দয়াল—বংশের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার বেশী আমার কাছে কেউ নয়, কিছু নয়। ও-কথা থাক্—

দয়াল আর কথা কহিল না। রামেশ্বর মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া টানিতে লাগিলেন। গাড়ী গভীর অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে।

চাহিয়া দেখিলেন গাড়ীর গদীমোড়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দয়াল ঘুমাইয়া গিয়াছে। নিদ্রাহীন চোখে রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন বাহিরের অন্ধকার পানে। অন্ধকার পৃথিবীর সর্বত্র—রামেশ্বরের বুকের ভিতরটাতে কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে। জিঘাংসার তীব্র-বিষাক্ত আগুন···

কিন্তু কেন এই জিঘাংসাবৃত্তি! রামেশ্বরের মনস্তত্ত্ব পড়া মন যেন ব্যাপারটার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে চাহিতেছে। মীনু তাঁহার কেহ নহে—কিন্তু সারা-জীবন প্রতিপালনে কি কোন মূল্য নাই? রক্তের সম্বন্ধই কি সব? না—তা যদি হইত তবে·····কিন্তু রামেশ্বর চিন্তাটা অন্যদিকে সরাইয়া লইলেন। রাজীব মীনুকে কাড়িয়া লইয়াছে পিতৃত্বের অধিকারে। রাজীব তাহার পিতা। আর রামেশ্বর কেহ নহেন। চমৎকার! ভাল—দেখা যাক কে জিতে! জিঘাংসার অগ্নি তিনি জ্বালিয়াই রাখিলেন।

আর্তনাদ আর হাহাকার চলিতেছে সারা দেশটা জুড়িয়া। বন্যা ও মহামারী-রূপে কলেরা দেখা দিয়াছে এমন ভীষণ ভাবে যে মানুষ পালাইবার পথ পাইতেছে না। সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষেরও আগাইয়া আসা দরকার। সেবা-প্রতিষ্ঠান দেশে বড় কম নাই। স্বেচ্ছাসেবক বিস্তর মেলে, কিন্তু আর্ততা ক্রমেই বাড়িতেছে।

প্রফেসার রাজীব অধিকারী দলবল লইয়া পৌঁছিয়াছেন গত সন্ধ্যায়। সর্বাগ্রে তিনি জনগণের নিকট হইতে জানিলেন কোথায় কিরকম সংক্রামক ব্যাধি চলিতেছে এবং ত্রাণকার্য কেমন ভাবে করা হইতেছে। স্থানীয় লোকজন তাঁহাকে এ বিষয়ে যথাযোগ্য খবর দিল। প্রফেসার রাজীব অধিকারী অতঃপর প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া লইলেন—কোন দিক দিয়া কেমন ভাবে কাজ আরম্ভ করিবেন। শ্যামল ও মীনু সর্বক্ষণ তাঁহার কাছে আছে এবং আরো আছে প্রায় জন পঞ্চাশ ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহার—যাহারা রাজীবের কথায় মৃত্যুর মুখেও যাইতে পারে।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করার পর সব ঠিক হইয়া গেল। আগামী সকাল হইতেই কাজ আরম্ভ করা হইবে একটি ছোট গ্রাম হইতে। নদীর কিনারায় এই গ্রামটির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ধন-ধান তো গিয়াছেই—

www.boiRboi.blogspot.com

গোরুবাছুর এবং ঘরবাড়ীও গিয়াছে। ইহার পর চলিতেছে সংক্রামক ব্যাধি যাহার প্রকোপ থামিতেছে না।

ঝোপঝাড়, জঙ্গল ও নদী লইয়া এই গ্রাম ও পাশাপাশি আরো কয়েকটি গ্রাম। প্রফেসর রাজীব এইখানে একটা ডাকবাংলোতে আশ্রয় লইলেন এবং কাছাকাছি গ্রামেও তাঁবু ফেলিয়া ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কাজ ভালই চলিতেছে।

তৃতীয় দিন পার হইয়া গেল। চতুর্থ দিন সকালেই একটু দূরের একটা গ্রামে গিয়াছে মীনু ও শ্যামল এবং আরো কয়েকজন! সন্ধ্যা হইতেছে, এবার তাহারা ফিরিবে। প্রফেসর রাজীবও এখানকার কাজ সারিয়া বাংলোতে ফিরিতেছেন—দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের আশ্রয়-বাংলোর নিকটেই একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। কে ও? কি চায়? রাজীব বলিলেন,

—কে তুমি? ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? কি চাও?

—মাছ লিবেন হুজুর! মাছ! বড় মাছ—লোকটা একটা মাছ দেখাইল।

—না—এখন এখানে মাছ খাওয়া নিরাপদ হবে না।

—একদম জ্যান্ত আছে হুজুর—

—থাক—আমি নেব না।

লোকটা তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল। বিরক্ত হইয়া রাজীব বলিলেন,

—উঁকী দিয়ে কী দেখছো? যাও এখান থেকে—যাও……

লোকটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কিন্তু রাজীবের মনে হইল মাছ বিক্রী তাহার উদ্দেশ্য নহে—বাংলোর ভিতরটাই ও দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কেন?—চিন্তাটা রাজীবকে বিশেষ ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু ভাবিবার কি আছে? এখানে তিনি একা নাই। তথাপি তাঁহাকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে।

মীনু ও শ্যামল এখনো আসিল না কেন? উহারা পাঁচজন গিয়াছে। হয়তো দূরে—আরো দূরে গিয়াছে। অপরিচিত স্থান এবং রাত্রির সামনের দিকটা অন্ধকার—কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে। প্রফেসর রাজীব ক্রমশ বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। বাংলো বাড়ীটা সর্বত্র তিনি স্বয়ং একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন লইয়া ঘুরিয়া আসিলেন! সকলেই আসিয়াছে শুধু শ্যামলের দল আসে নাই। কী হইল! কেন তাহারা আসিতেছে না!

রাত্রি বাড়িয়া চলিতেছে। না—শ্যামল বা মীনু ঐ দলের কেহই আসিল না। যেখানে গিয়াছে সে জায়গাটা এখান হইতে চার-পাঁচ মাইল দূর। তবে কি রাজীব সেখানেই দেখিতে যাইবেন? কর্তব্য ঠিক করিতে পারিতেছেন

www.boiRboi.blogspot.com

না তিনি। ওখানকার ঠাকুর যে রান্না করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া শুধাইলেন,

—বাউড়ি গ্রামটা ঠিক কতদূরে ?

—এজ্ঞে—তা, কোশ দু' আড়াই হবে—রাস্তা খারাপ—কাদা, পিছল—

—নদী আছে ?

—হ্যাঁ এজ্ঞে—নদী খাল—ঝোপজঙ্গল তো থাকবেই এদেশে বুনো গাছ—সাপ শেয়াল—আরও কত কি !

—তুমি পথ—চেনো ?

—এজ্ঞে তা আর চিনিনে ! আমার শ্বশুর বাড়ী যাবার পথ—ঐদিক পানেই রাসপুর, কাঁটাপালং ধমেতি হয়ে···

—থাক থাক—বাউড়ী যাব আমি। চল দেখি আমার সঙ্গে।

—এজ্ঞে এই রাত্তিরে ?

—হ্যাঁ—চল—বকশিস পাবে।

—এজ্ঞে তাতো পাবই। তবে কি আপনি আর আমি একলা···।

—না-না—তুমি আর আমি একলা নয়। আরো দুজনকে নিচ্ছি, চল !

—এজ্ঞে রান্না হয়েছে, খেয়েই রওনা হব।

—হ্যাঁ—তা মন্দ কথা নয়।

প্রফেসার অধিকারী সবাইকে খাইয়া লইতে বলিলেন কিন্তু নিজে কিছুই খাইলেন না। রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ চারজন লোক লইয়া রাজীব রওনা হইলেন বাউড়ী নামক গ্রামের উদ্দেশে মীনু ও শ্যামলের খোঁজে। চিন্তায় কপালটা ঘামিয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

শ্যামল আর মীনু একটু দূরেই আসিয়াছে আজ। এদিকটায় নাকি মড়ক কিছু বেশী। বেলা ন'টা নাগাদ নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছাইল। সত্যিই এখানে কে কার মুখে জল দেয়—এমন অবস্থা। ম্যালেরিয়ায় ওরা আগেই জখম হইয়াছিল, তাহার উপর এই জলপ্লাবন এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও আরো হাজার রকম রোগ উহাদের প্রায় নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে।

একটা স্কুল বাড়ীতে আড্ডা লইয়া তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। ঔষধ দেওয়া পথ্য দেওয়া এবং সাবধান হওয়ার জন্য কিছু উপদেশ দেওয়া চলিতে লাগিল। আশ-পাশের গ্রামেও যাইবে। বেলা অনেকটা হইয়াছে। ডাল-ভাত আলু সেদ্ধ রান্না হইয়াছে। সকলে খাইতে বসিল। কয়দিনই তাহাদের এই রকম খাওয়া চলিতেছে ! কিন্তু খাওয়া-শোওয়ার কথা ভাবিলে এসব কাজ করা যায় না।

www.boiRboi.blogspot.com

বেলা প্রায় দেড়টা। একজন লোক আসিয়া বলিল,

—এই পাশের গাঁয়ে একবার যাবেন বাবারা? ওখানে বড়ই মড়ক চলেছে।

—কোন্ গ্রাম? কতদূর?—শ্যামল জিজ্ঞাসা করিল।

—বাগাটুলি! এই আধক্রোশটাক হবেন! তুমি চলুন বাবা—আপনিই চল।

—বেশ থামো একটু। খেয়েই যাব আমরা।

লোকটি সদরে বসিয়া বিড়ি ধরাইল এবং দুইটা টান দিয়া বলিল,

বেঁচে থাকো বাবারা। তোমরা যে কি উপকার করছো দেশের, আহা! বলিহারি যাই—

শ্যামল বা অন্য কেহই কিছু বলিল না। খাওয়া শেষ হইলে শ্যামল মীনুকে বলিল,

—যাবে তুমি!

—হ্যাঁ—নিশ্চয়।—চলুন।

উহারা দুইজনে ফার্স্ট এইড্ বাক্স ও পথ্যাদি লইয়া লোকটির সহিত বাহির হইয়া গেল।

নিকটেই বাগাটুলি গ্রাম। বড় জোর পনর বিশ মিনিটের পথ—তবে রাস্তা কর্দমাক্ত ও পিচ্ছল। কিন্তু এই কয়দিন ঘোরাঘুরি করিয়া মীনু ও শ্যামল এরকম পথে চলায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। লোকটির পিছনে পিছনে তাহারা অনায়াসেই চলিয়া আসিল।

বাগাটুলি একদিন বড় গ্রাম ছিল—তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গ্রামের প্রান্তেই পাথরের মন্দির, ছোট ইটের বড় বড় বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও শিলালিপিতে। অদূরে প্রকাণ্ড এক জীর্ণ প্রাসাদ। লোকটি সেখানেই আনিল শ্যামল ও মীনুকে। ব্যস্ত স্বরে বলিল,

—আসেন দাদাবাবু দিদিমনি—এই বাড়ীতে আসুন।

—চল—শ্যামল ও মীনু সেই দীর্ঘ প্রাসাদের ভাঙা দরজায় প্রবেশ করিল।

কী বিপুল বাড়ী! সেকালের রাজাদের গড় হয়তো। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শ্যামল বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছে এই ভাঙাবাড়ীতে লোক কিভাবে থাকিতে পারে। জিজ্ঞাসা করিল,

—এ বাড়ীতে লোক কেমন করে থাকে হে?

—এজ্ঞে দাদাবাবু—বানের ভয়ে ক'জন এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—ও—তা হতে পারে। কোথায় আছে দেখি চল।

ঘরের পর ঘর—উঠানের পর উঠান পার হইয়া আসিল তাহারা—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। মীনু বলিল—

—না—সুবিধে লাগছে না। চলুন ফিরে যাই—আর যাবো না।

—ডর লাগছে নাকি দিদিমণি। এই তো আমি সঙ্গে রয়েছি। আসেন।

এখনো অনেকটা বেলা আছে, কিন্তু বাড়ীর এই জায়গাটায় অন্ধকার—মনে হয় সন্ধ্যা হইতেছে। মীনু কিছু বলিবার পূর্বেই শ্যামল বলিল—

—চল—চল—আমরা কারো কিছু ক্ষতি করিনি যে ভয় করতে হবে।

—আসেন—

আরো একটা উঠান পার হইল উহারা। ওদিকে একটা ঘরে কে যেন কাতরাইতেছে। শ্যামল ও মীনু গিয়া দেখিল, একটা লোক ছেঁড়া বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে মৃত্যুযন্ত্রণায়, শ্যামল আগাইয়া গেল—সঙ্গের লোকটি বলিল—

—আপনি: এই ঘরে আসেন দিদিমণি—ওখেনে উনার ইস্তিরিরও অসুখ—খুব জরুরী।

মীনু যাইবে কিনা ভাবিতেছে। শ্যামল বলিল—

—যাও না—যাও ওখানে। আমি একে দেখছি।

মীনু আর কিছু না বলিয়া লোকটির সঙ্গে অন্য ঘরে গেল। শ্যামল নিজেও লোকটির ডান হাতখানা ধরিয়া নাড়ি টিপিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল—লোকটির নাড়ির গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কী ব্যাপার দরজাটা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল কেন? বাতাসে। শ্যামল উঠিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতে যাইতেছে—বিছানায় শোয়া লোকটি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এবং লাফ দিয়া উঠিয়া লম্বা ঘরটার অন্য দিকের বন্ধ দরজাটা খুলিয়া চলিয়া গেল। পড়িয়া রহিল তাহার ছেঁড়া বিছানাটা। অপর দরজাটাও বন্ধ করিয়া দিল সে। আশ্চর্য! শ্যামল কি বন্দী হইল নাকি!

শ্যামলের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে তাহারা এক কঠিন চক্রান্তে বন্দী। কিন্তু কেন? কারণটা ঠিক মত বুঝিতে পারিতেছে না শ্যামল। নিজের জন্য তাহার চিন্তা নাই—মৃত্যুকে ভয় সে করে না। কিন্তু মীনুও নিশ্চয় অন্যত্র বন্দিনী হইয়াছে। তাহার জন্যই শ্যামলের মন নিদারুণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মীনু ঢুকিবার পথে একবার সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তখন আর না ঢুকিলেই ভাল হইত। কিন্তু কিরূপে জানিবে—তাহাদের সেবা-ধর্মের কাজেও বাধা দিবার জন্য চক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু এ চক্রান্ত নিশ্চয়ই অন্য কিছুর জন্য। শ্যামলের মনে হইল, এই চক্রান্তের সহিত প্রফেসার চৌধুরীর জীবনের কোন রহস্য নিশ্চয়

লুকাইয়া আছে। অথবা শ্যামলের জীবনের, কে জানে, মীনুর জীবনেও অনুরূপ কোন রহস্য আছে কি না। হ্যাঁ—মনে পড়িতেছে রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় মীনুর যেন কে হন!—তিনি প্রফেসর অধিকারীর নিকট কি জন্য আসিয়াছিলেন? মীনুকে তিনি চাহিতেছেন। এইখানেই কোন গুপ্ত-রহস্যের সূত্র আছে। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? মীনুকে উদ্ধারের উপায় বাহির করা সর্বাগ্রে দরকার।

শ্যামল ঘরটা ভাল করিয়া দেখিল। দুই প্রান্তে দুইটি দরজা সেকালের শক্ত শাল কাঠের। একটি মাত্র জানালা আছে। রডগুলি মোটা কাঠের। কোন রকমে এই রডের অন্তত দুটি ভাঙিয়া যদি বাহির হওয়া যায়—অন্য আর কোন উপায় নাই। শ্যামল দেখিল—রডগুলি খুবই শক্ত—তবে কাঠের। উহা কাটা যাইতে পারে। কি দিয়া কাটিবে!

শ্যামলের হঠাৎ মনে পড়িল, তাহার ফার্ষ্ট-এইড্ বাক্সে ছুরি আছে। তৎক্ষণাৎ ছুরিখানা বাহির করিয়া রড কাটিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে বুঝিল—ঐটুকু ছুরি দিয়া ঐ শক্ত রড দুটিকে কাটিতে বহু সময় ব্যয় হইবে। এখন করা যায় কি? কয়েকটা লাথি মারিয়া দেখিল, সেকালের শক্ত কাঠের জানালার কোন ক্ষতিই হইল না। অতঃপর ক্লান্ত শ্যামল সেই ছেঁড়া বিছানাটায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কী সে করিবে!

না—কোন উপায় সে দেখিতেছে না। হাতঘড়িটায় দেখিল প্রায় আড়াই ঘণ্টা পার হইয়া গিয়াছে। বেলা হয়তো আর নাই—কারণ ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—শ্যামল কিছুই দেখিতেছে না আর।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল। প্রবেশ করিল একজন ষণ্ডামার্কা জোয়ান। আসিয়াই শ্যামলকে ধরিয়া ফেলিল এবং মোটা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। উহার সহিত লড়াই করিয়া কোন ফল হইবে না বুঝিয়া শ্যামল প্রতিবাদ করিল না। তবু প্রশ্ন করিল,

—আমাদের বন্দী করে লাভ কি?

—চোপ রহ—

এছাড়া কোন উত্তর মিলিল না।

ওদিকে মীনুকে লইয়া কোণের একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সঙ্গী লোকটি বলিল—

—যাও দিদিমণি—উখেনে রুগী আছে—হৈ ঘরটায়। আমি জল আনি।

—আচ্ছা।

www.boiRboi.blogspot.com

মীনু নিঃশঙ্ক চিত্তে নয়—কিছুটা ভয়েই প্রবেশ করিল এবং খানিকটা অগ্রসর হইল। হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হইয়া গেল। মীনু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখিল,—দরজার লোকটি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মীনু সভয়ে বলিল,

—ও কি—দরজা খোলো—ও মশাই ;

উত্তর নাই। মীনু আবার ডাকিল—আবার। না—উত্তর পাওয়া যাইবে না। মীনুর দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিয়া পড়িল। কী হইবে। কী ইহারা করিবে তাহাকে লইয়া! চিন্তায় ভয়ে মীনু যেন দিশাহারা হইয়া সেইখানেই মেঝেতে বসিয়া পড়িল।

দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় চলিয়া গেল—কেহই আসিল না, না শ্যামল, না বা সেই চাষী লোকটি—কিম্বা আর কেউ। ক্লান্ত-শ্রান্ত-ভীত মীনু শুকাইয়া গিয়াছে। মনে পড়িতেছে রায় রামেশ্বরের কথা—রাজীবের স্নেহের পরশ—কত কি মনে পড়িতেছে—হায়—সব শেষ হইয়া গেল। এই ঘরেই মীনুকে আমৃত্যু বন্দী থাকিতে হইবে, কিম্বা কি হইবে কে জানে! কেন ইহারা তাহাকে বন্দী করিল——কেন—কেন?

কতটা সময় গিয়াছে। দিন না রাত্রি—কে জানে। কাঁদিতে কাঁদিতে মীনু আপনিই কখন চুপ করিয়া গিয়াছে। নিজের ভাগ্যের উপর তাহার আর বিশ্বাস নাই। যা হইবার হইবে। চিরদিনের ঈশ্বর বিশ্বাসিনী মীনু ভগবানের উপর নিজের সব ভার ছাড়িয়া দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল সে।

অকস্মাৎ একটা দরজা খুলিয়া গেল ভেতর দিককার। একজন ঝি আসিয়া বলিল—

—এদিকে আসুন দিদিমণি—মুখ-হাত ধোন—জলখাবার খাবেন।

—না—আমাকে ছেড়ে দিতে বলো—নইলে ভাল হবে না।

—কি করবে?—ঝি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল—যুদ্ধ করবে নাকি!

—আমি না করি—আমার বাবার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি ছেড়ে দেবেন না।

—তাই নাকি—কে তোমার বাবা দিদিমণি?

—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায়—তাঁর হাতে তিন হাজার ডাকাত আছে।

—ডাকাত!

—হ্যাঁ—তোমার মনিবকে বলবে, যদি ভাল চায় তো আমায় ছেড়ে দিক—শ্যামলবাবু কোথায়?

—আমি জানি না দিদিমণি। আমাকে তোমার জন্যই রাখা হয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

এসো, মুখ-হাত ধুয়ে নাও—ছেড়েই দেবে তোমাকে—এসো।

—না—ছেড়ে না দিলে কিছুই খাবো না আমি। যাও····

ঝি বারম্বার বলা সত্ত্বেও মীনু উঠিল না।

নির্জন পথ—আগে পাছে দুইটি লণ্ঠন লইয়া চলিতেছেন প্রফেসর রাজীব অধিকারী। সঙ্গের লোকেরা তাঁহার সহিত চলিতে পারিতেছে না—কারণ, মনের ব্যাকুলতায় রাজীব অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হাঁটিতেছেন। তাঁহার শুধু বারম্বার রামেশ্বরের কথাই মনে পড়িতেছে। কী না করিতে পারে ঐ রায় রামেশ্বর। মীনুকে হত্যা করা তাহার পক্ষে একটা মশা মারার সামিল। কলিকাতায় তাহা না করিতে পারিয়া ক্রোধ বশে রামেশ্বর যে এখানে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে—ইহা রাজীবের পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল। বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ লোকটা কেন বাংলোর কাছে দাঁড়াইয়া ছিল? কেন! কি তাহার মতলব? বাংলোতে তো মীনু তখন ছিল না। রামেশ্বর কি রাজীবকেও হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে নাকি। অসম্ভব কিছু নয় তাহার পক্ষে। কিম্বা অপর কোন মতলবও থাকিতে পারে—প্রফেসর অধিকারী এইসব কথাই ভাবিতেছেন।

পাকা পাঁচ মাইল পথ। পথ তো নয়—পথিকের প্রাণনাশের ফাঁদ। তবু প্রফেসর অধিকারী আসিয়া পৌঁছিলেন। গভীর রাত্রি—নিস্তব্ধ গ্রাম—যেন কেহ কোথাও নাই। অনেক দূরে একটা দোকানঘর—মালিক ঘুমাইতেছে। তাহাকেই ডাকিয়া তুলিলেন।

—অ্যাঁ—কি বলছো? পুলিশ নাকি?—লোকটি সভয়ে বলিল।

—না—এখানে আজ রিলিফ-ওয়ার্ক করতে লোক এসেছিল কিনা জান?

—হ্যাঁ—তাঁরা তো চলে গেছেন বেলা দুটোর সময়।

—কোন গ্রামে গেছেন জান?

—না বাবু—অত খবর জানি না। আমার দোকানে চা খেয়েছেন সব। তবে শুনলাম, বাগাটুলি যাবেন।

—বাগাটুলি কত দূর? কতবড় গ্রাম?

—ঐ তো মাইলট্যাক—যান, দেখুন। গাঁ তো বড়ই ছিল এককালে—এখন ভাঙতা অবস্থা। শুধু লোকজন আছে জনকতক—রাজাও নাকি ছিল। তাঁর গড় রাজবাড়ী ওখেনে আছে। পুরোনো রাজবাড়ী—লোকজন কেউ নাই—পোড়ো বাড়ীটাই আছে শুধু।

রাজীব আর সময় নষ্ট করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বাগাটুলির দিকে রওনা

www.boiRboi.blogspot.com

হইলেন। বেশী দূর আসিতে হইল না। কতকগুলো আলো দেখিতে পাইলেন —কাহারা যেন আসিতেছে। প্রফেসর থামিলেন। যাহারা আসিতেছিল, তাহারা কাছে আসিল, রাজীব দেখিলেন উহারা তিনজন।—তাঁহারই দলের লোক। কিন্তু মীনু বা শ্যামল নাই। ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন—

—মীনু কৈ! শ্যামল কোথায়?

—জানি না স্যার—ওরা যে কোথায় কে জানে। ফেরেন নি—তাই আমরা আপনার কাছে খবর দিতে যাচ্ছিলাম।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব একটা গাছের ডাল ধরিয়া ফেলিলেন। মাথাটা তাঁহার ঘুরিয়া গিয়াছিল হয়তো। অবশেষে বসিয়া পড়িলেন তিনি ঐ কাদার উপর। একজন বলিল—

—অত ঘাবড়াবেন না স্যার—হয় তো ওরা আরো দূরে কোথাও গেছে।

—না—রাজীব বলিলেন—ওখানে তোমরা আড্ডা কোথায় করেছিলে?

—একটা স্কুল-বাড়ীতে। স্কুল ছুটি—কেউ ছিল না সেখানে। একজন বাসায় ছিলাম—আর দু'জন করে দু'দল বেরিয়েছিলাম গ্রামে। শ্যামল আর মীনুদি একসঙ্গে বেরিয়েছিল—ওরা আর ফেরে নি স্যার।

—ঐটুকু তো গ্রাম। তোমরা খোঁজ করেছিলে?

—বিস্তর স্যার! বিস্তর খোঁজ করেছিলাম। ওখানে একটা গড় আছে। খুব পুরোনো রাজবাড়ী—মন্দির—ঠাকুর—সব পোড়ো। শুধু সাপ থাকে। সেখানেও খোঁজ করেছি আমরা। না স্যার, ওরা ওখানেও নেই।

—তাহলে গেল কোথায়?

—কি জানি স্যার। আমরা ভেবেছিলাম আপনার কাছেই ফিরে গেছে।

—না—যায়নি।

রাজীব এখন কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি নিশ্চয় ধারণা করিলেন—ইহা রামেশ্বরের কাজ। চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে রামেশ্বর। মীনুকে তো লইয়াছেই—শ্যামলকেও চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কোথায় লইয়া গিয়াছে কে জানে!

এদিকে আর খোঁজাখুঁজি করা বৃথা! রামেশ্বর এতো কাঁচা ছেলে নয় যে, উহাদিগকে এখানেই রাখিবে। নিশ্চয় সে মীনু ও শ্যামলকে অন্য কোথাও দূরে সরাইয়া দিয়াছে! এখন কি করা যায়? পুলিশের সাহায্য লইতে হইবে নাকি! হ্যাঁ, তাছাড়া উপায় কি! কিন্তু এতদূর আসিয়া তিনি ঐ পোড়ো বাড়ীটা না দেখিয়াই ফিরিয়া যাইবেন! না, তাহা উচিত হইবে না! প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—

www.boiRboi.blogspot.com

—চল—ঐ পোড়ো বাড়ীটা আমি একবার দেখতে চাই।

কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না। সকলেই ফিরিল এবং আরো প্রায় পনের মিনিট হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপের মত বিশাল প্রাসাদে পৌঁছিল। অন্ধকার বাড়ীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। প্রফেসার অধিকারী সাপ-খোপের ভয় মন হইতে দূর করিয়া দিয়া অন্দরের দিকে একা চলিলেন। চারদিকের অন্ধকার যেন ঠেলিয়া যাইতে হইতেছে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ভিতর দিকের উঠানের আগাছাগুলি যেন পা দিয়া মাড়ানো হইয়াছে। টর্চটা ঠিক আছে—কিন্তু আর জ্বালিলেন না।

কে যেন কোথায় কাঁদিতেছে! না। কেহ নয়! বাতাসের শব্দ—না—কান্নাই। কী আশ্চর্য! কোন দিক হইতে কান্নার শব্দটা আসিতেছে? প্রফেসার অধিকারী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। হ্যাঁ কান্নাই!

—উঠে এসো—

কঠোর কর্কশ স্বর কানে আসিল মীনাক্ষীর—যেন গর্জন। কিন্তু মনকে সে ঠিক করিয়া লইয়াছে। মৃত্যু-পণের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল—উঠিল না। অন্ধকার ঘরের কোণার দিক হইতে আবার কে যেন বলিল—

—ওঠো—হাতমুখ ধুয়ে খাও—না খেলে কারো কিছু যায় আসে না এখানে।

—আমারও কিছু যায় আসে না। তবে তুমি জেনে রেখো আমার বাবা রামেশ্বর রায় তোমাদের উচিত শাস্তি দেবেন।

—তাই নাকি—হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার বাবা দশ মুণ্ড রাবণ নাকি!

—না—আমার বাবা শ্রীরামচন্দ্র—দশ-মুণ্ড তুমিই—তুমিই রাবণ—রাক্ষস!

—তোমার বাবাকে আমরা ডরাই না মীনু—উঠে এসো—খেয়ে নাও—তোমাকে তারপর চালান করতে হবে—বহুদূর—কতদূর তুমি জান না—বহু দূর-দেশে—

—বুঝেছি, আমার বাবার ভয়ে আমাকে দূর-দেশে নিয়ে যাবে—কিন্তু জেনে রাখো—আমার বাবা তোমাদের কিছুতেই রেহাই দেবেন না—চোর—ডাকাত সব।

—খাবে কি না?

—না—খাব না। যা খুসী করতে পার তোমরা।

—আচ্ছা—থাক—এখানে কারো বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়।

মীনু আর কোন কথা শুনিতে পাইল না। লোকটি হয়তো চলিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত অবসন্ন মীনু দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে—কে জানে কখন ঘুমাইয়া গিয়াছে।

www.boiRboi.blogspot.com

পাশের ঘরে একটা হ্যাজ্যাগ লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঘরটার দরজা জানলা সবই বন্ধ। আলো বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। ঐ ঘরে একটা পুরানো ভাঙা চেয়ারে বসিয়া আছেন রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর। পদতলে দয়াল সর্দার। একদিকে মদের বোতল ও অন্য দিকে একটা ছোরা। রামেশ্বর বলিলেন—

—ঐ ছেলেটা কি করছে?

—কি আর করবে? জানলার রড্ কাটবার চেষ্টা করছিল চাকু ছুরি দিয়ে। তাই ওকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এলাম। ওকেও তো সরাতে হবে হুজুর।

—হাঁ—নিশ্চয়! এদের কাউকেই রাখা চলে না। ছেলেটা খুবই ভাল। বেঁচে থাকলে দেশের গৌরব বাড়াতে পারতো। কিন্তু উপায় নেই দয়াল—উপায় নেই। ওকেও মরতে হবে।

—ওর সঙ্গে হুজুরের যুবা বয়সের চেহারার খুব মিল আছে হুজুর!

—চুপ কর দয়াল। ওসব কি কথা বলছিস। ও আমার কে?

—ঠিক কথা হুজুর—বেঁচে থাকলে পুলিশে খবর দেবে ও।

—পুলিশে খবর দেবার আরো লোক আছে দয়াল—রাজীব স্বয়ং দেবে খবর। কিন্তু তার আগেই আমরা কাজ সেরে চলে যেতে চাই। দে—ঢাল আর এক পাত্র। ওদিকে কলকাতার কাজটা ঠিক হবে তো?

—হ্যাঁ হুজুর—ওখানে কানাই আছে। সে ঠিক কাজ সারবে।

দয়াল মদ ঢালিয়া দিল। রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে মদ্যপান করিতেছেন। দয়াল চুপচাপ বসিয়া রহিল। জোরালো আলোটার চারিদিকে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ উপদ্রব করিতেছে।

বিরক্ত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—

—আলোটা সরা এখান থেকে।

দয়াল আলোটা সরাইয়া লইল। রামেশ্বরকে আর ভাল দেখা যাইতেছে না। তীব্র সুরার গুণে তাঁহার মূর্তি এবং মুখশ্রী ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের তলায় ছোরাটা দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার কোমরে ছয়-ঘরা রিভলভারটাও ঠিক আছে। আর দেরী কেন! রাত্রি তো দ্বি-প্রহর অতীত! অতএব এই সময়ই শেষ করিয়া দেওয়া যাক। উঠিলেন রায় রামেশ্বর। হাতে ছোরাখানা তুলিয়া লইলেন। দয়াল খানিকটা দূরে বসিয়া ছিল। বলিল—

—কাজটা কি নিজের হাতেই করবেন হুজুর?

—হ্যাঁ—দয়াল—নিজের হাতে যে লতায় জল সেচন করেছি, নিজের হাতেই তাকে ছিঁড়বো—নিজের হাতে আগে কখনো একাজ করিনি।

www.boiRboi.blogspot.com

—ও বড় নেশার কাজ হুজুর—মদের চেয়েও নেশা। একবার করলে আবার করতে ইচ্ছে যায়। জহ্লাদের হাত হয়ে ওঠে—মানুষ তখন বাঘ হয়ে যায়।

—তোমার ইচ্ছে করছে নাকি দয়াল?

—তা হুজুর—একটা মস্ত শিকার—অনুমতি করেন তো—

—না দয়াল—একাজ আমি স্বয়ং করবো—মীনুর মৃত্যু আর কারো হাতে হতে দেব না আমি—যাও—তুমি দেখে এসো।

দয়াল দেখিতে গেল। রামেশ্বর ছোরাখানা পরীক্ষা করিলেন। সুতীক্ষ্ণ ছোরা—বহু নর-রক্তে অভিষিক্ত—দয়ালের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু ছোরা কেন! গুলি করিয়াই তো মীনুর কোমল বক্ষ বিদীর্ণ করা সহজ হইবে! দূর হইতে জানালা-পথে রামেশ্বর অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু গুলি যদি ঠিক জায়গায় না লাগে—যদি মাথায় না লাগিয়া পাশে লাগে—যদি মীনুর মরিতে দেরী হয় তো কষ্ট পাইবে—মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিবে মীনু। ছোরা একেবারে বুকের ভিতর বসাইয়া দেওয়া যায়—মীনু তৎক্ষণাৎ ইহলোক ছাড়িবে। মৃত্যু-যন্ত্রণা অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু কে জানে—ছোরায় না গুলিতে মৃত্যু সহজ হয়। রামেশ্বর নিজহাতে একাজ তো করেন নাই। না—কখনো না। হ্যাঁ—একবার যেন—অনেকদিন হইল—একজনকে নিজহাতে—না-না না—নিজহাতে তো মারেন নাই। দয়ালই গলা টিপিয়া তাহাকে ভবধাম হইতে সরাইয়াছিল। উঁহু, না—মনে পড়িতেছে—আঁতুড়-ঘরে বিষাক্ত সাপ ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বাহির হইবার কোন পথ রাখা হয় নাই—সাপের তীব্র বিষে নীল হইয়া গিয়াছিল সে—মৃত্যু-মুহূর্তে রামেশ্বর গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! আশ্চর্য! নিঃশব্দে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও সে বলিয়াছিল,—"তোমাকে ধন্যবাদ—তোমার অন্ন গ্রহণের পাপ এই মহাবিষে নষ্ট হয়ে গেল—আমার দেহ পবিত্র রইল। ওপারে গিয়ে আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করবো—"

আরো বলিয়াছিল—"তোমার জন্য প্রার্থনা করছি, জীবনের শেষদিনেও যেন তুমি বুঝতে পার—প্রেম আছে, আছে স্নেহ-ভালবাসা নিশ্চিত নির্মম হয়ে আছে। ঈশ্বর তোমার অন্তরে সেই অনুভূতি দিন।"—আশ্চর্য!

কিন্তু আরো আশ্চর্য আছে। সেই মৃত্যুরূপী গোক্ষুর বিষধর বাচ্চাটিকে স্পর্শ করে নাই। স্নেহভরে পরিত্যাগ করিয়া রায় রামেশ্বরকে যেন দেখাইয়া দিয়াছিল—স্নেহ আছে—বাঘের আছে—সাপেরও আছে! আজ রামেশ্বর সেই বাচ্চাটির কুসুমিত দেহটিকে ধ্বংস করিবে। সাপ যাহা পারে নাই—রামেশ্বর তাহাই করিবে।....

কিন্তু এসব কি ভাবিতেছে রামেশ্বর! কর্তব্য যাহা, তাহা করিতেই হইবে।

www.boiRboi.blogspot.com

অকারণ দেরী কেন? মনকে দুর্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য—রামেশ্বর ছোরাখানা রাখিয়া এক পাত্র মদ নিজে ঢালিয়া লইলেন—হ্যাঁ—বংশের সম্মান রক্ষার জন্য একাজ অবশ্য করণীয়। অতএব ঢালিলেন রায় রামেশ্বর—হাতে ছোরা—মনে অদম্য হত্যাপিপাসা—

পাশের ঘরে মীনা ঘুমাইয়া গিয়াছে হয়তো। বাহিরের হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটার ছায়াময় আলো আলোকিত করিয়াছে ঘরখানা অতি সামান্যভাবে। সেই আধোঅন্ধকারে দেখা যাইতেছে মীনুর মুখ—স্বর্গের পারিজাত—না না—অতুলনীয়—সাগরলক্ষ্মীর মত সুন্দর। কিন্তু রামেশ্বর এ কি ভাবিতেছে! মীনু সুন্দর তো রামেশ্বরের কি! মীনুর বুকে ছোরাটা বসাইয়া রামেশ্বর দেখিবেন—রাজীব ও ভদ্রার রক্তের বন্যা বহিয়া যাইবে—চমৎকার প্রতিশোধ। হ্যাঁ—আর দেরী নয়—রামেশ্বর সজোরে দরজাটা ঠেলিলেন।

—উঁ—কে?

মীনু জাগিয়া উঠিল। রামেশ্বর ত্বরিতে বাহিরে আসিলেন। মীনু আবার বলিল—

—কে? কে?.....

রামেশ্বর একটা কম্বলে নিজেকে আপাদমস্তক মুড়িয়া ঢুকিলেন।

—কে—?

উত্তর না দিয়া রামেশ্বর ছোরা তুলিতেছেন। ভীতা মীনু বলিল,

—মেরো না—মেরো না—আমাকে মেরে কোন লাভ হবে না—আমার বাবার কাছে—রায়বাহাদুর রামেশ্বরের কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি তোমাকে লাখ টাকা দেবেন। মেরো না—

জিভ উল্টাইয়া রামেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন—

—রামেশ্বর তোর কেউ নয়—

—তিনি আমার বাবা—আমার জন্য তিনি সর্বস্ব দিতে পারেন।

—না-না—রামেশ্বর কণ্ঠ আরো জোরে আরো বিকৃত করিয়া বলিলেন—

—রামেশ্বর তোকে মারতে হুকুম করেছে—

—মিথ্যাবাদী—শয়তান—আমার বাবা আমাকে মারতে হুকুম করেছেন!

—রামেশ্বর তোর মাকে মেরেছে—তোকেও মারবে। জানিস!

—না—জানি না! জানতে চাই না। তুমি নিশ্চয় সেই বেদে—যে আমাকে আমার বাবার কোল থেকে চুরি করেছে—রামেশ্বর আমার বাবা—বাবা—আমার অবাধ্য পিতা—

—না। শোন আহাম্মক মেয়ে—তোর বাবা ঐ উদার মহান রাজীব—ঐ

www.boiRboi.blogspot.com

দেশসেবক—ঐ আর্ত-আতুরের বান্ধব রাজীব—শুনছিস্—?

—না। শুনবো না। ভগবান বললেও বিশ্বাস করবো না আমি। আমি জানি আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর—

না-না-না—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে চেয়েছে। কারণ, তুই তার কেউ নোস্—তুই আর্তত্রাতা রাজীবের—

—না—আমি শুনবো না—মীনু কানে আঙুল দিয়া বলিল,

—রাজীব মহান হোতে পারেন, উদার হোতে পারেন, তাতে আমার কি। পৃথিবীতে বিস্তর মহান পুরুষ আছেন—তাই বলে তাদের 'বাবা' বলতে হবে নাকি?

—কিন্তু জানিস—রামেশ্বরই তোকে খুন করতে পাঠিয়েছেন আমায়।

—অসম্ভব—হোতে পারে না! আমার হাত ছাড়া তাঁর খাওয়া হয় না—আমাকে ঘুমুতে দেখেও তিনি পাহারা দেন—আমার জন্য নিজের শরীরের রক্ত দিতেও পিছপা নন—দিয়েছেন আমার বড় একটা অসুখের সময়। আমার বাবা তোমাকে পাঠিয়েছেন আমাকে খুন করতে। মিথ্যুক শয়তান—কে তুমি? তোমার গলার আওয়াজ চেনা-চেনা লাগছে। নিশ্চয় তুমি সেই বেদে—কে তুমি—?

—আমি তোকে খুন করতে এসেছি।

—বেশ—করো—তবু তোমাকে আমি 'বাবা' বলবো না। আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়।

মীনু কাঁদিয়া উঠিল—আমার বাবা—আমার বাবা!....

—ভুল—ভুল! মিথ্যে....

—না—মিথ্যে নয়। আমি আমার বাবা ছাড়া কাউকে চিনি না। মাকে আমি দেখিনি। আমি রায় রামেশ্বরের বুকে চড়ে বড় হয়েছি। রায় রামেশ্বর আমার বাবা। বেশ—আমাকে খুন করো—তবু আমি বলবো আমার বাবা রায় বাহাদুর রামেশ্বর....

রামেশ্বর কম্বলের ভিতর ঘামিতেছেন। না, কাঁপিতেছেন তিনি। সমস্ত দৃঢ়তা—বজ্রকঠিন সংকল্প যেন বর্ষা-ধারার মত গলিতেছে। একি হইল।

ছোরাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন রায়বাহাদুর রামেশ্বর। এরপর কি করিবেন? কে যেন আসিতেছে? নিশ্চয় রাজীব অধিকারী। এখনি দেখিয়া ফেলিবে....ত্বরিতে ওঘরে চলিয়া গেলেন তিনি—চোখে তাঁহার জল।

অন্ধকার উঠোনের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজীব উৎকর্ণ হইয়া

www.boiRboi.blogspot.com

শুনিতেছেন—কে যেন কাঁদিতেছে—হয় তো কথা কহিতেছে কাহারা। কিন্তু কোথায়—কোন ঘরে? কোন দিকে। এই বিশাল বাড়ীর কোন মহলে কথা হইতেছে—কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না রাজীব। হাতের টর্চটা জ্বালিবেন কিনা, ভাবিতে ভাবিতে অন্ধকারেই অগ্রসর হইলেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকার জন্য চক্ষের জ্যোতি কিছু বাড়িয়াছে। দেখিতে পাইতেছেন তিনি। চলিলেন।

একটা উঁচু বারান্দা। ঠোক্কর খাইলেন অধ্যাপক। হাঁটুতে বেশ লাগিয়াছে। সামলাইয়া বারান্দাতে উঠিলেন। কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হইল। হ্যাঁ—কোণার দিক হইতে শব্দ আসিতেছে। অতি সাবধানে রাজীব অগ্রসর হইলেন। একেবারে কোণের ঘর—ভিতর হইতে বন্ধ। একটা জানালাও এদিকে নাই যে ভিতরে কি ঘটিতেছে দেখিতে পাইবেন। বন্ধ দরজাটায় কান পাতিলেন প্রফেসর অধিকারী। অল্প অস্পষ্ট কথা শোনা যাইতেছে। মীনুর গলা! হ্যাঁ—মীনুরই তো!

—'আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর রায় বাহাদুর'—কান্না-ভরা কণ্ঠস্বর তাহার।

একটা কি যেন মাটিতে পড়িল—হয়তো ধাতব কিছু—ছোরা-ছুরি নাকি! আর কোন কথা শোনা গেল না। শুধু মীনুর ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নার শব্দটা আসিতেছে। কী এখন করিবেন রাজীব অধিকারী? এই শাল কাঠের শক্ত দরজা ভাঙিয়া প্রবেশ করা তাঁহার একার পক্ষে সম্ভব নয়—বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিবেন নাকি! কিন্তু ততক্ষণে এখানে কি ঘটিবে কে জানে! না—রাজীব ব্যাপারটা ভাল করিয়া না দেখিয়া যাইতে পারেন না। রাজীব এপাশ ওপাশ ঘুরিলেন। বারান্দায় হয়তো ওদিকে যাইবার পথ আছে।

হ্যাঁ—আছে। বারান্দার ঠিক মাঝামাঝি ওদিকে যাইবার দরজা—রাজীব অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অধিকদূর যাইতে হইল না শুনিতে পাইলেন। কে যেন বলিতেছে—

এদিকে বারান্দায় একজন লোক ঢুকেছে—হয়তো পুলিশ! কি করা যায়?

—দেখি!

উত্তরদাতার কথা এতো মৃদু যে রাজীব ভালরকম শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি সতর্ক হইবার জন্য একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনের তীব্র আলো পড়িল বারান্দায়। সর্বাঙ্গে কম্বল চাপা কে একটা লোক লণ্ঠনটা বারান্দায় নামাইয়া এক তাড়া চাবি ছুঁড়িয়া দিল রাজীবের দিকে। লোকটা সবেগে আবার ঘরে ঢুকিল।

ব্যাপার কি রাজীব কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। মিনিট দুই তিন

www.boiRboi.blogspot.com

অপেক্ষা করিলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন—যে-ঘর হইতে লোকটি আসিয়াছিল সেই ঘরের দিকে। গিয়া দেখিলেন, স্বয়ং রামেশ্বর রায় সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন—পদপ্রান্তে শূন্য বোতল একটা। ঘরে আর কেহ নাই। রামেশ্বরের চোখে জল। রাজীব বিস্মিত স্বরে বলিলেন—

—রামেশ্বর তুমি এখানে ?

—হ্যাঁ রাজীব—এসো। ঘরে আর চেয়ার নেই। আমি চলে যাচ্ছি—বসো—ওঘরে মীনু আছে, পরের ঘরটায় সেই ছোকরা আছে। ওদের নিয়ে যাও। তোমার কাজ সেরে কলকাতা যেও।

—খুন-খারাপী কিছু করতে পারলে না বুঝি।

—না—রামেশ্বর চোখটা মুছিয়া কম্বলটা ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—রাজীব—তুমি মহান—দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করো না—একটা প্রার্থনা।

—বল। সাধ্য থাকলে নিশ্চয় রাখবো।

—আমার আজকের কু-কীর্তি যেন মীনুকে জানিও না। শুনলে সে মনে বড় কষ্ট পাবে।

—তুমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলে রামেশ্বর ?

—হ্যাঁ রাজীব—কিন্তু পারলাম না। কোনদিনই পারবো না। তোমার মেয়ে তোমারই থাক—আমি অভাগা নিঃসন্তানই থাকিলাম—আর—

—বলো—

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন—রাজীব বলিলেন—

—যেও না—বলো····

—না—আর বলবার কিছু নেই। আমি যে এখানে এসেছি তাও জানিও না মীনুকে। যদি সম্ভব হয়—কাল বা পরশু তোমার ক্যাম্পে গিয়ে তাকে একবার দেখে দেশে চলে যাব। যাই রাজীব।

আশ্চর্য। দু'চোখে ঝর-ঝর জল রামেশ্বরের—কিন্তু মুহূর্তে ওদিকের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন তিনি। রাজীব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া দেখিলেন কেহ নাই—রামেশ্বর চলিয়া গিয়াছেন। রাজীব চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—

—ফিরে এসো রামেশ্বর—আজ সত্যি তুমি মীনুকে ভালবাস। ফিরে এসো। তোমার মেয়েকে তুমি নিয়ে যাও····

না কোন জবাব পাওয়া গেল না। নিরুপায় অধ্যাপক হ্যাজ্যাগ লণ্ঠনটা লইয়া আবার বারান্দায় আসিলেন এবং চাবির গোছা হইতে দুই তিনটি চাবি বাছিয়া ঘুরাইয়া পাশের ঘরের তালাটা খুলিয়া দেখিলেন—হাত পা বাঁধা শ্যামল শুইয়া আছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—স্যার!

—হ্যাঁ আমি—ছুরি দিয়া শ্যামলের বাঁধন কাটিয়া দিলেন তিনি। শ্যামল বলিল—

—মীনু কোথায়?

—ওঘরে আছে।

—চলুন—দেখি!

দুইজনে পাশের ঘরে আসিয়া তালা খুলিয়া ফেলিলেন। মীনু নিঃশব্দে কাঁদিতেছে—চোখের জল মুছিয়া আনন্দে বলিল—

—আপনি! এখুনি আমাকে খুন করতে এসেছিল একজন····

—কি জন্য আমাদের এমন করে বন্দী করল স্যার? আমরা তো টাকা পয়সার লোক নই····শ্যামল বলিল।

রাজীব একটু ভাবিয়া বলিলেন—

—তুমি নও—কিন্তু মীনু বড় লোকের মেয়ে। বুঝলে শ্যামল—চোর-ডাকাতরা সব খবর রাখে—তারা মীনুকে ভয় দেখিয়ে একখানা চিঠি হয়তো লিখিয়ে নিত ওর বাপের নামে—"টাকা দিলে মীনুকে ছেড়ে দেব।"—এই রকম কিছু মতলব ছিল বোধ হয়।

—তা হবে স্যার—এরকম হয় নাকি আমেরিকায়—ইউরোপে—কিন্তু এদেশে····

—এখানেও হয়—এসো—

—ওঃ এই রাত্রে আপনাকে বিস্তর কষ্ট পেতে হলো স্যার আমাদের জন্য।

—তা হোক—তোমাদের পেলাম এই যথেষ্ট।

সকলে একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিল এবং দলের অন্যান্য সকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্যাম্পের দিকে রওনা হইল। রাত্রি প্রায় দুইটা। রাজীব মীনুকে কোলের কাছে লইয়া হাঁটিতেছেন। পথ সংকীর্ণ—সর্প-সংকুল এবং পিচ্ছল—অত্যন্ত সাবধানে চলিতেছেন সকলে। মীনুর চোখে তখনো জল। হঠাৎ সে বলিয়া বসিল—

—বলে কি জানেন—বলে, তোর বাবা তোকে খুন করতে আমাকে পাঠিয়েছে।

—ও রকম কত কথা চোর-ডাকাতরা বলে মা। চলো—রাত বেশী নেই—চলো।

মীনুর কথাটাকে আমলই দিলেন না প্রফেসার অধিকারী। শ্যামল বলিল—

—এবার থেকে আমাদের সাবধানে চলাফেরা করতে হবে স্যার।

প্রফেসার অধিকারী যেন দূর হইতে কথা বলিতেছেন। অর্থাৎ এসব কথায় কান দেবার মত মন তাঁর নাই। কী যেন বিশেষ ভাবনা ভাবিতেছেন তিনি। ভাবিতেছেন—রামেশ্বর যে মীনুকে ভালবাসে না—তাহাকে হত্যা করিতে

www.boiRboi.blogspot.com

চাহিয়াছে বারম্বার, এই সত্য নিজেই তিনি মীনুকে জানাইয়াছেন। বেশ বোঝা যাইতেছে মীনু সেকথা বিশ্বাস করে নাই। বিশ্বাস করিবে না কোনদিন। কারণ —রাজীবের কথাটা সত্য নহে। রামেশ্বর মীনুকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা স্নেহের অভাবের জন্য নহে। তাহা শুধু রামেশ্বরের বংশগৌরবের মিথ্যা অভিমান-জনিত। মীনুকে রামেশ্বর সত্যিই ভালবাসে—আত্মজা দুহিতাকে যতখানি ভালবাসা সম্ভব—রামেশ্বরের স্নেহ তাহা অপেক্ষা কিছুই কম নহে! কিন্তু ঐ বংশঅভিমান কিরূপে ছাড়ানো যাইবে রামেশ্বরের মন হইতে! উহা তাহার মজ্জাগত বিশ্বাস—তাহার শিরার শোণিত। তথাপি আজ রাজীব বুঝিতে পারিলেন, রামেশ্বর মীনুকে অত্যন্ত ভালবাসে। ভালই। আনন্দই হইতেছে রাজীবের। কিন্তু কিরূপে সমস্ত দিক রক্ষা পাইতে পারে।

ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না রাজীব। রামেশ্বরের প্রকৃতিকে ভালই চেনেন রাজীব। আজ উচ্ছ্বাসবশে হয়তো রামেশ্বর মীনুকে ছাড়িয়া দিয়া গেল—কিন্তু আগামীকাল অথবা দুই মাস পরে যে আবার রামেশ্বরের ভূয়া বংশ গৌরব তাহাকে জিঘাংসা বৃত্তিতে জাগ্রত করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে। রাজীব জানেন—অকারণ রামেশ্বর তাহার নিরপরাধী পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছেন —শুধু তাহাই নহে—পুত্রকে পর্যন্ত স্বীকার করেন নাই। কারণ—আর কিছুই নহে—ভূয়া বংশ-গৌরব। জমিদারী ঠাট্ এবং মেকী আভিজাত্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখিবার মন নাই রামেশ্বরের—এই সত্য রাজীবের ভালই জানা আছে। মীনুকে নিরাপদে রাখিতে হইলে আরো কিছু করা দরকার। কিন্তু কি তিনি করিবেন। মীনুকে লইয়া তিনি সুদূর দেশে চলিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু মীনু যাইবে না। কারণ মীনু সর্ব মন-প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করে সে রামেশ্বরের কন্যা! আশ্চর্য রামেশ্বরের ভাগ্য—আশ্চর্য্য সত্যি!

চাঁদ উঠিতেছে! শেষ রাত্রের চাঁদ—ক্ষীণ হইলেও সুন্দর। রাজীব দেখিলেন —চিন্তার জন্য তাঁহার গতি মন্থর হওয়ায় মীনু ও শ্যামল কিছুটা আগাইয়া গিয়াছে। বন-পথের সর্পিল রাস্তা—পথের পাশে বন্য কুসুম—গাছে গাছে শিশির বিন্দুর পতন শব্দ—বড়ই মনোরম। কাব্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে দিক্‌বধূ! সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে আলো দেখাইয়া চলিতেছে। রাজীব বলিলেন—

—বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে—আলোটা নিবিয়ে দাও। অন্ততঃ কমিয়ে দাও।

আলো কমাইয়া দেওয়া হইল। প্রকৃতি যেন নিরাবরনা হইয়া উঠিল। রাজীব ধীরে ধীরে চলিতেছেন। আগে আগে চলিতেছে মীনু ও শ্যামল— দেখিতে পাইলেন, পথের পাশের একগুচ্ছ বনফুল তুলিয়া শ্যামল মীনুর খোঁপায় পরাইয়া দিল।

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন রাজীব। মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। ইচ্ছা করিয়াই তিনি চুরুটটা ধরাইবার অছিলায় আরো খানিকটা পিছাইয়া পড়িলেন।

পদ্মার কথা বলিয়া রাজীব কি ভয় দেখাইয়াছিল রামেশ্বরকে? না—পদ্মা সত্যই কোথাও আছে। কিন্তু এতোদিন তো তাহার বাঁচিয়া থাকিবার কথা নয়। হয় তো ঐ রাজীবই তাহাকে অন্নবস্ত্র দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।—ভাবিতেছিলেন রায় রামেশ্বর।

বিরাট সহর কলিকাতার ঠিকানা না জানা থাকিলে পদ্মার মত একটি তুচ্ছ মেয়েকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। কোথায় তাঁহার খোঁজ করিবেন রামেশ্বর? বিস্তর ভাবিয়া তিনি অবশেষে কানাই ও দয়ালকে নিযুক্ত করিয়াছেন পদ্মার খোঁজ করিবার জন্য। তাহারা পদ্মাকে কিন্তু চেনে না। না-চেনা কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নহে।

কিন্তু রামেশ্বরের বরাত ভাল। রাজীবের সহিত মীনুকে একটা বস্তিতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আন্দাজ করিয়া লইয়াছিলেন—পদ্মা যদি এখনো বাঁচিয়া থাকে তবে আছে এই বস্তিতে। রাজীবের ঘরে সে নেই—তাহা রামেশ্বর ভালভাবেই দেখিয়াছেন।

ঐ বস্তিতে যে মহিলাটি রাজীবকে অভ্যর্থনা করিল—রামেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন—সে পদ্মা—পদ্মা তবে বাঁচিয়া আছে। আর কেহ আছে কিনা জানিবার সুযোগ হয় নাই তাঁহার—কারণ ঐ বস্তির নোংরা জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ রামেশ্বরের নাসারন্ধ্রে পীড়া জন্মাইতেছিল। তিনি দয়াল ও কানাইকে বস্তিটা চিনিয়া রাখিতে বলিয়াই ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কানাই মহিলাটিকে চিনিয়া আসিয়াছিল। রামেশ্বর দয়াল ও কানাইকে হুকুম করিয়াছিলেন—

—ওকে সরাতে হবে—পারবি?

—এ আর এমন কঠিন কি কাজ হুজুর।

—বেশ—হাজার টাকা পুরস্কার।

—আপনারই তো খাচ্ছি হুজুর।

অতঃপর মীনু ও রাজীবের পশ্চাৎ-ধাবন করিয়া রামেশ্বরকে মেদিনীপুর আসিতে হইয়াছে। কানাইকে তিনি হুকুম করিয়া আসিয়াছেন।—পদ্মাকে যেন সাবাড় করিয়া দেওয়া হয়। কানাই দয়াল অপেক্ষা কম দক্ষ নহে। হয়তো ইতিমধ্যে কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার—

কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতেছেন—না—আর এসব কাজ তিনি করিবেন না।

www.boiRboi.blogspot.com

পদ্মা যদি কোনরূপে বাঁচিয়া গিয়া থাকে তো থাক—তাহাকে মারিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে আর রামেশ্বরের নিকট কোন দাবী করিতে পারিবে না। বহুদিন হইল—পদ্মা রামেশ্বরের জীবন হইতে খসিয়া গিয়াছে।

কিন্তু রায় রামেশ্বর ভাবিতে লাগিলেন—পদ্মার একটা বাচ্চা হইয়াছিল। তাহার ফটো-সহ পদ্মা একবার অর্থের জন্য আবেদন করিয়াছিল রামেশ্বরের নিকট। সেই ফটো ও চিঠি আছে রামেশ্বরের বাক্সে। সে ছেলে কোথায়?

মনের মধ্যে যে সন্দেহটা উঁকি দিতেছে—রামেশ্বর আর তাকে বাহিরের আলোকে আনিবেন না। না-না-না—কিছুতেই না। রামেশ্বর আজ আর কাহাকেও পুত্ররূপে স্বীকার করিতে পারেন না। মীনুই তাঁহার কন্যা—একমাত্র সন্তান। আর কেহ যদি সত্যই থাকে তবে সে থাক—সে ভগবানের পুত্র হইয়া থাক—অথবা সে থাক ঐ রাজীবের পুত্র হইয়া। রামেশ্বর তাহাকে কোনদিন গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

চিন্তায় মুখখানা কালো হইয়া উঠিল রামেশ্বরের। কিন্তু তথাপি ভাবিতেছেন—কয়েকদিন হইয়া গেল—কানাইয়ের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে পদ্মাকে ইহধাম হইতে সরাইবার জন্য! হয়তো কানাই সে আদেশ পালন করিয়াছে অক্ষরে অক্ষরে। তাহার দক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই রামেশ্বরের! কিন্তু যদি তাহা! না হইয়া থাকে—তবে রামেশ্বর আর সে চেষ্টা করিবেন না। তবে তিনি কি করিবেন?

তীর্থযাত্রা করিবেন। হ্যাঁ—তীর্থযাত্রাই। কোন তীর্থ? রামেশ্বর নিজের মনেই হাসিয়া ফেলিলেন। তীর্থ তাঁহার জন্য আছে নাকি কোথাও! ঈশ্বর যদি থাকেন তো রামেশ্বরের জন্য নতুন কোন রকম তীর্থ তিনি সৃষ্টি করিবেন—যেখানে শুধু জ্বালা—শুধু তাপ, শুধু যন্ত্রণা····

রামেশ্বরের চোখ জ্বলিতে লাগিল। ভাবিতেছেন—অন্তত বিশ্বে তিনি আজ একা। এমন একাকিত্ব রামেশ্বর আর কোনদিন অনুভব করেন নাই। আর্ত কণ্ঠে রামেশ্বর চেঁচাইয়া উঠিলেন—

—মীনু! মা!

পদ্মা ঘুমাইতেছিল। হয়তো স্বপ্ন দেখিতেছে—কে যেন ঘরে ঢুকিল।—কে? —কে তুমি! পদ্মা প্রশ্ন করিল।

উত্তর নাই। ঘুমটা ভাঙিয়া গেল পদ্মার। চমকিয়া জাগিয়া দেখিল—না, ঘুম নয়, সত্যই কে যেন আসিয়াছিল—তাহাকে জাগিতে দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে। চোর! নিশ্চয় চোর! কিন্তু তাহার ঘরে চোর কিজন্য আসিবে, পদ্মা ভাবিয়া

www.boiRboi.blogspot.com

পাইল না—চোরে তাহার কি চুরি করিতে আসিবে! তবে কি—তবে কি!....

কিন্তু পদ্মা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মন যেন বারম্বার বলিতেছে—হ্যাঁ—সে-ই—সে-ই—আসিয়াছিল। কিন্তু কি মতলবে? মতলব আর কিছু নহে—তাহাকে ইহধাম হইতে সরাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু লোকটা কি নিজেই আসিয়াছিল? না—তাহার নিযুক্ত লোকই আসিয়াছিল!

শ্যামল ঘরে নাই। কয়েকদিন পূর্বে প্রফেসার অধিকারীর সহিত তাহারা মেদিনীপুর গিয়াছে—এবং হয়ত সেদিকেও চক্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছেন রামেশ্বর। তবে? তবে কি—চিন্তায় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল পদ্মা। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালিয়া দেখিল—তাহার ঘরের খিল ওপাশ হইতে খোলা হইয়াছে একটা তার দিয়া—তারটা ওইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। পাশের ঘরে শ্যামল থাকে। পদ্মা আলো লইয়া সেই ঘরের দিকে গেল। সে ঘর ঠিকই আছে—কিন্তু কে যেন ঢুকিয়াছিল। বই-খাতা কিছু ওলোটপালট হইয়া রহিয়াছে—কে আসিয়াছিল?

চিন্তায় ঘামিয়া উঠিল পদ্মা। ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভয় করিলে তো চলিবে না! নিজের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে না সে—কিন্তু শ্যামল! রামেশ্বর কি তাহাকেও হত্যা করিবার জন্য কোন চক্রান্ত করিয়াছে? কিছুই আশ্চর্য নয় তাহার পক্ষে। পদ্মা যতখানি তাহার সম্বন্ধে জানে—তাহাতে শ্যামলকে হত্যা করা কিছু বেশী কথা নয়। কারণ শ্যামলকে তিনি কিছুতেই স্বীকার করিবেন না।

পদ্মা কি করিবে কিছুই ভাবিতে পারিতেছে না। প্রফেসার অধিকারী খুবই বুদ্ধিমান এবং সুচতুর ব্যক্তি। শ্যামল তাঁহার কাছে আছে। তথাপি পদ্মার মাতৃ-মন শ্যামলের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল। সে রাত্রে আর ঘুমাইতে পারে নাই পদ্মা।

শ্যামলের পত্র আসিয়াছিল কয়েকদিন পূর্বে—"মা—আমরা ভাল আছি। তোমার কোন চিন্তা নাই।" —লিখিয়াছিল ও ঠিকানা দিয়াছিল।

সকালে পদ্মা পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোককে বলিল—

—একটা 'টেলি' করে দিতে হবে শ্যামলকে—

—কেন? টেলি কেন?

—ওরা ফিরে আসুক—

—সেকি! প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে গেছে কাজ না সেরে ফিরবে?

—তবে আপনি শুধু 'কেমন আছে সে যেন জানায়'—লিখে দিন।

—অনর্থক টাকা খরচ করবেন? চিঠি দিন না একখানা।

—না—টাকা খরচ হোক—আপনি 'তারটা' করে দিন।

পাশের বাড়ীর ভদ্রলোক জানাইলেন যে তিনি 'তার' করিয়া দিতে রাজী। কিন্তু আজ রবিবার। সাধারণ 'তার' যাইবে না। কাল তিনি শ্যামল বা প্রফেসার অধিকারীকে 'তার' করিয়া দিবেন।

নিরুপায় হইয়া পদ্মা আর কিছু বলিল না। সারাদিন কিন্তু তাহার অন্নজলে রুচি হইল না। রাত্রে প্রায় কিছু না খাইয়াই শুইয়াছে। অকস্মাৎ 'খুট'—শব্দ।

পদ্মা তৎক্ষণাৎ সচকিত হইয়া উঠিল। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলিতেছে; পদ্মা উঠিয়া দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইবে—পাশ বালিশটায় চাদর চাপা দিয়া সে সরিয়া গেল ঘরের কোণার দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে পদ্মা।

চোর ঘরে ঢুকিল।—বালিশটাকেই সে পদ্মা ভাবিয়াছে। সজোরে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল—পদ্মা সুড়ুৎ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দরজাটা টানিয়া দিল এবং শিকল তুলিয়া দিল বাহির হইতে। লোকটা বন্দী হইয়াছে। পদ্মা ইহার পর পাশের ঘরের লোকজন ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে—পদ্মা ত্বরিতে চলিল লোক ডাকিতে।

কানাই ঘরের মধ্যে বন্দী। কিন্তু রায় রামেশ্বরের লোকরা আহাম্মক নহে। কানাই মুহূর্তে বিপদ বুঝিতে পারিল এবং কোমর হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া ঐ ছিটে বেড়ার ঘরের একদিকে যে একটি ছোট জানালা আছে—তাহাই কাটিয়া লাফ দিয়া ওদিকের গলিতে পড়িল।

পাশের বাড়ীর দুইজন লোক লইয়া পদ্মা যখন ফিরিল—দেখিল ঘরে কেহ নাই। জানালাটা কাটা দেখিয়া সকলেই বুঝিল চোর পলাইয়াছে।

বহু অনুসন্ধানই করা হইল চোরের। মস্ত বড় বস্তি—বিস্তর সরু গলি আচ্ছন্ন। চোরকে আর পাওয়া গেল না। সকলেই ঘরে ফিরিল—এবং সকলেই ভাবিল, পদ্মার এমন কি সম্পদ আছে যাহার জন্য চোর আসে। টাকাকড়ি তো তাহার নাই—ঘটিবাটিও বিশেষ নাই। পদ্মা কিন্তু বুঝিয়াছে—যে আসিয়াছিল, সে রামেশ্বরের লোক—এবং আসিয়াছিল তাহাকে হত্যা করিতে। কিন্তু এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু সে বলিল না।

পরদিন শ্যামলকে টেলিগ্রাম করিল পদ্মা। তাহারা যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসে। পদ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে নানা কারণে। প্রফেসার অধিকারীও যেন আসেন।

একটা তাঁবুর বাহিরে প্রফেসার অধিকারী ক্যাম্বিস চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। শ্যামল ও মীনা এখনো রিলিফ ওয়ার্ক করিয়া ফেরে নাই।

www.boiRboi.blogspot.com

অদূরবর্তী একটা পুষ্পিত তরুর দিকে চাহিয়া প্রফেসার অধিকারী চুরুট টানিতেছেন। সহসা কে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পিছনে বসিয়া পড়িল। প্রফেসার অধিকারী বিস্মিত হইয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন—মীনা।

—চুপ—চুপ, ও আমায় ধরতে পারবে না—বলবেন না যেন।

সামনের দিক হইতে শ্যামল আসিল। বেশবাস অত্যন্ত রুক্ষ, স্নান-আহার কিছুই হয় নাই। প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামল হঠাৎ থামিয়া গেল।

—মীনু কৈ—শ্যামল? বড্ড দেরী করে ফেললে তোমরা।

—যেখানেই যাই শুধু আর্তনাদ স্যার! সে দেখে আর খাওয়ার কথা মনে থাকে না। মীনু তো আমার আগেই এলো!

—দেখ—এসেছে তা হলে।

—তাঁবুতে ঢোকেনি তো স্যার? ওঃ! কি সাংঘাতিক ছুটতে পারে স্যার। আমি একদম হার মেনে গেলুম।

মৃদু হাসিয়া প্রফেসার অধিকারী বলিলেন—হারা উচিত হয়নি তোমার শ্যামল! তুমি যার ছেলে—সে কোথাও কখনো হারেনি।

—আমার বাবাকে কি আপনি চেনেন স্যার?

প্রফেসার অধিকারী আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—কিছু কিছু। যাও, স্নান করে খাও গিয়ে তোমরা। মীনু!

চেয়ারের পিছন হইতে মীনা বাহির হইয়া আসিল। কবরী খুলিয়া গিয়াছে। মুখে খড়ি উড়িতেছে। ক্লান্তিতে সারা শরীর কোমল হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি হাসিতে এবং আনন্দে সারামুখ উদ্ভাসিত। পরণের কাপড় অবিন্যস্ত। সংযত করিতে করিতে বলিল—ভেবেছেন কলকাতার মেয়ে! সাঁতারে কাল হারিয়েছি, আজ দৌড়ে, আসছে কাল····

—ঘোড়দৌড়ে! কেমন?

—না, ঘোড়ায় আমি চড়তে পারিনে,—আসছে কাল ঝগড়ায়!

—আমি আগেই হেরে রইলাম। স্যার সাক্ষী।

—বেশ—তা হলে অন্য কিছু, গাছে চড়ায়।

—ওতেও হেরে যাব, গাছে চড়া আমার অভ্যাস নেই।

—সত্যি নাকি হে শ্যামল? গাছে চড়তে পার না!—প্রফেসার অধিকারী হাসিতে লাগিলেন।

—না স্যার, আমায় এমন লক্ষ্মী ছেলে করে মানুষ করেছেন যে একেবারে 'বাঙালী' হয়ে উঠেছি।

—আচ্ছা, তাহলে স্যারের পা টেপায়।····

www.boiRboi.blogspot.com

প্রফেসার অধিকারী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

—তোরা এখন স্নান করে খেয়ে নে দেখি। কাল কিসের পালা দিবি তা আমি ঠিক করে দেব।

চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া তিনি উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। মীনা তাকাইয়া দেখিল প্রফেসার অধিকারী অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিল,

গান

ও গো সুন্দর!

ধরো ধরো ধরো আমায় ধর গো—সুন্দর!

আমি আছি আকাশ ব্যেপে

তাইতো বাতাস উঠেছে কেঁপে গো····

বনের ফুলের গন্ধে আজি তাই সে হলো মন্থর—

ওগো, সুন্দর····

আছি মেঘের কালো চুলে

আছি তোমার—আছি তোর—আছি তোমা···

—আর বুঝি মিলাতে পারছেন না! আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।—আছ আমার মন মুকুলে—আছ তোমার চোখের জলে—থাকো জুড়ে অন্তর!

মীনা হাসিয়া বলিল—বাঃ আপনি তো বেশ মিলিয়ে দিতে পারেন?

—অপরেরটা খুব পারি—নিজেরটাই পারছি নে।

চোখ পাকাইয়া মীনা বলিল—চুপ! কথার প্যাঁচ তো বেশ আছে দেখছি! এর মধ্যে শয়তানি শিখেছেন!

বলিয়াই মীনা ক্যাম্পে ঢুকিল, শ্যামল অন্য কাজে চলিয়া গেল। বাতাসে মীনার গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। মধুর করুণ, হৃদয়গ্রাহী—চিত্তহারী।

সরু রাস্তাটির উপর স্বল্পালোকে দুইজন মনুষ্যমূর্তি দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ বোঝা গেল উহাদের একজন রামেশ্বর, অপরজন দয়াল।

অন্য দিক হইতে বেদে সম্মুখবর্তী হইল।

—কি কত্তা! এহানে আইছেন? কেমন দেখতিছেন কত্তা?

—হাঁ হে—এসেছি; তোমার মনিব কোথায়? ক্যাম্পেই আছে?

—আজ্ঞে না কত্তা, বারাইছেন। কি কাম আমারে বলতি পারেন।

—চমৎকার রিলিফ-ওয়ার্ক করছে তোমার মনিব। আমিও কিছু টাকাকড়ি দিতে চাই; আর যদি—কাজও কিছু করতে পাই—

www.boiRboi.blogspot.com

ও কত্তা, আপনাগোর এমত সুমতি হইছে। আসেন আসেন, শ্যামলবাবু সব ঠিক কইরা দিবার আছেন।

—না—তোমার মনিব আসুন, তাকেই দরকার আমার।

—মীনু মা আছেন। আসেন কত্তা, চা খাইয়া যান, আসেন।

রামেশ্বর দয়ালের দিকে চাহিলেন—দয়ালের সহিত চোখের ইঙ্গিত হইল—পরে বলিলেন—চল—তোমার মনিবের জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

সকলে অগ্রসর হইলেন। ক্যাম্পের সামনে ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসিলেন রামেশ্বর। দয়াল কিছু দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিল। রামেশ্বর একাকী বসিয়া কি যেন ভাবিতেছেন। মীনা সুসজ্জিতা হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

রামেশ্বরকে দেখিয়া মীনা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—বাবা—! তুমি কখন এলে বাবা?

—ক'দিনই এসেছি মা, তোকে খুঁজে বার করতে দেরী হলো। রাজীব কোথায়?

—এই তো ছিলেন। কোথায় গেলেন এক্ষুনি! এখনি আসবেন। ওঁর বিস্তর কাজ বাবা। কোথায় কে কতটা কষ্ট পাচ্ছে—তারই খবর করছেন দিনরাত।

মীনার দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন—এই বন্দীজীবন তোর ভাল লাগছে মা? বেশ তো হেসে খেলে বেড়াচ্ছিস! খুবই আনন্দে আছিস দেখছি!

—বন্দী আমি নেই বাবা—বরং বৃহত্তর জীবনে মুক্তি পেয়েছি। তোমার বিশাল প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে কোনদিন তাকাতে পারিনি; এখানে এসে দেখলাম, মানুষ কত দুঃখী—কত অসহায়, কি মর্মন্তুদ ব্যথা-বেদনা নিয়ে সে জীবনের পথে হেঁটে চলে। যিনি আমাকে এই জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছেন, তিনি মানুষ নন—বাবা—দেবতা।—মীনু রাজীবের উদ্দেশে জোড়হস্ত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—আমি যখন ইচ্ছে, তোমার কাছে যেতে পারি বাবা, তিনি আমায় সে স্বাধীনতাও দিয়ে রেখেছেন—কিন্তু—

—কিন্তু কি মা—মীনু?

—আসবার ইচ্ছে আমার ছিল না বাবা, দৈবচক্রে এসে পড়েছি। কিন্তু আমার মার কথা তুমি কোনদিন আমাকে কিছুই জানাও নি বাবা—আমার জানতে ইচ্ছে করে। শুনলাম, আমার অভাগী মা বহু দুঃখ পেয়েছেন বহু নির্যাতনও নাকি সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। সব কথা আমি শুনিনি বাবা—প্রফেসার অধিকারী জানেন—তিনি আমায় বললেন সব ···

—থাক মীনু—বুঝেছি, রাজীব তোকে আমার বিরুদ্ধে—

—ছিঃ বাবা! তাঁর সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করো না। তিনি তোমার

www.boiRboi.blogspot.com

সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা আমায় বলেন নি। আর আমি অন্যের কথা কেন শুনবো বাবা? আমি আর কারো কথা বিশ্বাস করি না বাবা। করবো না। তবে আমার মার কথা তুমি আমায় সব বলবে বাবা?

—বলবো, কথা খুব বেশী নেই আর। তবু তোকে সবই বলবো, কেমন করে তুই রায় রামেশ্বরের কোল-জোড়া ধন হয়ে আছিস। আমি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি মা, আমার একমাত্র মেয়ে—আমার বংশের শেষ প্রদীপ-শিখা তুই—চল মা, বাড়ী চল। এসব কাজ ভালো হতে পারে, কিন্তু তোর নিজের হাতে করবার মতো কাজ নয়—টাকার দরকার—দিচ্ছি আমি।

—প্রফেসার অধিকারীর সামাজিক গর্ব কিছু কম নয় বাবা। ওসব বলে আমাকে আর ভুলাতে পারবে না। এ সব নিজের হাতেই করবার কাজ—তাই তোমার সঙ্গে বাড়ী ফেরার পূর্বে আমি এ কাজ শেষ করতে চাই। এসব কাজের একটা নেশা আছে বাবা তুমিও যোগ দাওনা, ভাল লাগবে—দেখবে! বাবা কিছু খাও····

একটা বয় খাদ্যাদি লইয়া আসিল। মীনা সারাদিন খায় নাই। তাহার মুখ শুকাইয়া রহিয়াছে! রামেশ্বর দেখিলেন। বলিলেন,

—তুই খা মা, আমি এখন খাব না।

মীনু খাইতে বসিল। রামেশ্বর চাহিয়া আছেন। খাওয়া হইল। অতি সামান্য খাদ্য। রামেশ্বর দেখিলেন মীনু হাত ধুইল।

কিছুক্ষণ পরে প্রবেশ করিলেন রাজীব। খদ্দরের পোষাক ঝলমল করিতেছে অঙ্গে। বলিলেন—শোন রামেশ্বর—আমি সাপের বিষ নিয়ে গবেষণা করি। তুমি সবচেয়ে বিষধর সাপ—তাই তোমার বিষটা সমস্তই আমার লেবরেটারীতে আনবার চেষ্টা করেছি। ঐ আমার মীনু মা! তুমি এসেছ রামেশ্বর—তোমার বিষদাঁত ভেঙে আমি তোমায় এই বুড়ো বয়সে মানুষ করবো ভেবেছিলাম—ঈশ্বর সদয়—তা হয়েছে। কিন্তু—মীনু ভেতরে যাও তো মা। রামেশ্বরের সঙ্গে আমার কথা আছে।

মীনু তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,

—তোমাদের কথা শেষ হলে আমায় ডাকবে বাবা।

—কথা কিছু নাই রাজীব। মীনুকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

—শোন রামেশ্বর! আমার পিতৃত্বকে তুমি দীর্ঘকাল ভোগ করেছ। চিরকালই করতে পারতে, কারণ মীনুকে সত্যি ভালবাস! আমি তাকে তোমার মেয়ে বলেই জগতে পরিচিত করে দিতে পারতাম রামেশ্বর, কিন্তু····

কিন্তু আর কিছু নেই রাজীব—থাকতে পারে না। সারা পৃথিবী জানে

www.boiRboi.blogspot.com

রায়বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী মীনাক্ষী। রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা সে। তার সত্য পরিচয় জানবেন যদি ভগবান কোথাও থাকেন। তার পৃথিবীর পরিচয়—আইন ও আদালতের সাক্ষীপ্রমাণের সকল পরিচয়, সে আমারই মেয়ে এবং সেই পরিচয়ই তার প্রকাশ থাকবে—অন্যথা হবে না। ডাক মীনুকে—মীনু!

—থামো রামেশ্বর—জোর করে কিছু করা তোমার ঠিক হবে না এখানে। এখানে তোমার লাঠিয়াল নাই—বরং আমার ছাত্র-সৈন্যরা আছে। আর আমি জানি—আদালতে তুমি যাবে না····

—আদালতে গেলে তোমাকে জেলে দিতে পারি—জান রাজীব?

—জানি—কিন্তু আদালতে গেলে তোমার বংশের মাথায় তুমিই ঘোল ঢালবে। অতএব তুমি সেখানে যাবে না। কিন্তু রামেশ্বর আর কি কিছু তোমার শোনবার নেই? তোমার জীবনের গত দিনের বিস্তৃত বহু ঘটনার কথা?

—না—ওসব কাব্যিপনার আমি ধার ধারি না, মীনুকে ছেড়ে দাও রাজীব।

রাজীব যেন কি একটা কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন। পরে বলিলেন—না শোন। এতদিন তুমি মীনুর বাবা ছিলে, এখন আমি কিছুদিন তার পিতৃত্ব ভোগ করতে চাই। তাকে আমি পল্লীগ্রামের একটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ে করে রাখতে চাইনে। আমি চাই, সে শিক্ষায়, সমাজ-সেবায়, দেশের নানা কাজে এগিয়ে আসবে। সবার পুরোভাগে তার আসন নেবে। তার লৌকিক পরিচয় যাই হোক তার সত্য পরিচয় তো তোমার অজানা নয় রামেশ্বর! তার রক্তে আছে বিপ্লব-বহ্নি, তাকে হতে হবে ভারত মাতার যোগ্য সন্তান। তুমি তাকে জমিদার কন্যা করে, পটের-বিবি করে রেখেছ। তা হয় না রামেশ্বর—তা আমি হতে দেব না।

—তা হলে ভালয় ভালয় দেবে না?

—না—

—বেশ। কিন্তু তুমি জেনে রেখো রাজীব, এই পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই—যা আমার বুক থেকে মীনুকে কেড়ে নিতে পারে।

—বেশ—দেখা যাবে! চোরের ওপর বাটপাড়ী করতে চাও রামেশ্বর! কিন্তু শোন—

—শোনবার আর কিছু দরকার নেই রাজীব—চললুম—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর উঠিলেন। রাজীব হাসিতেছেন। হাসিয়া বলিলেন—

—অত চটাচটির কি দরকার রামেশ্বর—মীনু এখন আমার কাছেই থাক—তাকে সমাজ-সেবার কাজ শেখাচ্ছি—যোগ্য পাত্র খুঁজে তার বিয়ে দেব—তখন অবশ্য নিশ্চয় তোমাকে ডাকবো····আসবে তো?

www.boiRboi.blogspot.com

—বিদ্রূপ করছো রাজীব? ভাল—দেখা যাবে—

ক্রুদ্ধ রামেশ্বর মুহূর্তে চলিয়া গেলেন।

রাজীব হাসিতে লাগিলেন। নিজের মনে বলিলেন—তোমার বিষদাঁত আর নেই রামেশ্বর—এখন তুমি ঢোঁড়া।

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতেছে পদ্মা। শ্যামলের চিঠি আসিয়াছে—তাহারা শীঘ্র ফিরিবে। পদ্মা নিজের মনে বিগত দিনের কথা ভাবিতে লাগিল।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে সেই সেই বহু পুরাতন কাহিনী। হ্যাঁ—রূপকথাই তো। জমিদার-গৃহিণী হইতে চলিয়াছে গ্রাম্য মেয়ে পদ্মা। সকলেই তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। আবার মজাও দেখিতেছিল অনেকে। রামেশ্বরকে যাহারা চেনে তাহারা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে নাই কিন্তু কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য হইল না। দুর্দান্ত জমিদার একটা ভাঙা শিব মন্দিরে পদ্মার হাতের মালা গ্রহণ করিলেন এবং সকলকে জানাইলেন—গন্ধর্ব মতে এই বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

প্রতিবাদ কেহই করে নাই। করিবার সাহসও কাহারও ছিল না। ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সকলেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। রহিল পদ্মা ও তাহার বৃদ্ধা মাতা। সুখেই রহিল, কিন্তু ক'দিন? মাত্র বৎসর খানেক। তারপর—

তারপর শোনা গেল, জমিদারের বৃদ্ধ পিতা আপত্তি করিয়াছেন। বলিয়াছেন এইরূপে বিবাহিতা বধূকে ঘরের আনা হইবে না—ইহা রক্ষিতার সামিল—বধূ নহে। বড় লোকের ছেলের অমন দু-চারটা থাকে। বংশের কুলবধূ তাহাকে করা যায় না। না—তাহা সম্ভব নহে।

আশ্চর্য! ঐ জমিদার-তনয়—যাহার দাপটে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায় —তিনি টুঁ শব্দটি করিলেন না। শুধু পদ্মাকে বলিলেন—পেটের ছেলেটাকে ওষুধ খাইয়ে মেরে ফেলো—তারপর চলে যাও দেশান্তরে—ওকে রাখলে বিস্তর বিড়ম্বনা ঘটবে—আজই যাও—

তাই যাব—সেখানে গিয়েই যা হয় করা যাবে—পদ্মা বলিয়াছিল অশ্রুসজল নয়নে।

নিরুপায় পদ্মা ও তাহার মা অতঃপর কি করিয়াছে, কেমন ভাবে সন্তানটিকে বাঁচাইয়াছে—বড় করিয়াছে—ভগবান জানেন; আর জানেন রাজীব অধিকারী। রাজীবের ঠিকানা জানা ছিল—ঐ জমিদার-পুত্রই জানাইয়াছিল একদিন কথাপ্রসঙ্গে —পদ্মা তাহার মাকে লইয়া তাঁহারই আশ্রয় ভিক্ষা করে। সন্তানটি তখন বৎসর পাঁচের। উদার মহাপ্রাণ রাজীব নির্বিকার চিত্তে তাহার সব ভার

www.boiRboi.blogspot.com

গ্রহণ করিয়াছিল। তদবধি শ্যামলের অভিভাবকের সবকিছু কাজ তিনিই করিতেছেন।

পদ্মার হাতের টাকা বহু আগেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ছেলের ফটোসহ পুনরায় কিছু টাকা দিবার প্রার্থনা জানাইয়া পদ্মা যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহার জবাব আসে নাই।

ইহার পর পদ্মা আর কোন খবর দেয় নাই—খবর রাখেও না। কিন্তু রাজীব রাখেন। খুব ভালভাবেই রাখিয়াছেন—রাখিবার বিশেষ হেতু তাঁহার কন্যা মীনু। নতুবা হয়তো এতো বেশী খবর তিনি রাখিতেন না। খবর লইয়া রাজীব জানিয়াছিলেন—পদ্মার কথা রামেশ্বর আর উচ্চারণ করেন না—হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভুলিয়া গেলে তো চলিবে না। যে সন্তান বড় হইয়া উঠিতেছে—শরীরে স্বাস্থ্যে এবং শিক্ষায় যে সন্তান সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপের পর ধাপ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে—তাহার একটা পিতৃ-পরিচয় অবশ্যই প্রয়োজন। সমাজে বাস করিতে হইলে যাহা দরকার শ্যামলকেও তাহা পাইতে হইবে। পদ্মা একথা বারম্বার ভাবিয়াছে। কিন্তু রাজীব ইহা ভাবিয়াছেন কি না, জানা নাই পদ্মার। হয়তো তিনি ভাবেন নাই—কারণ শ্যামলকে তিনি পুত্রবৎ দেখিয়া থাকেন এবং অনেকেই জানে শ্যামল তাঁহার পালিত পুত্র শুধু নহে দত্তক পুত্র।

অধ্যাপক অধিকারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান যথেষ্ট। তদুপরি তিনি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। তাঁহার পুত্রত্বের গৌরব কম কিছু নহে। কিন্তু সে কথা তো সত্য নয়। শ্যামল কি তাহার পিতৃ-পরিচয় কোনদিন পাইবে না। শ্যামল তো বহুবার এ প্রশ্ন করিয়াছে—'জবালা'র মতই হয়ত তাহার মাকে মনে করিতেছে শ্যামল। না—পদ্মা আর বিলম্ব করিবে না—একবার রামেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে চাহিবে—শ্যামলের পিতৃত্ব তিনি স্বীকার করিবেন কি না। হয়তো তিনি রাজী হইবেন না—এতোদিন পরে মহা সম্মানিত রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায় অকস্মাৎ পুত্র কোথায় পাইলেন—স্ব-গ্রামে এ প্রশ্ন জনগণের মনে হওয়া স্বাভাবিক—তথাপি পদ্মা একবার শেষবারের মত প্রশ্ন করিবে রায় রামেশ্বরকে।

শ্যামল কোনদিন রামেশ্বরের বিষয়-সম্পত্তি লইতে গ্রামে যাইবেও না। না—কোন প্রয়োজন নাই। প্রফেসার অধিকারী তাহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন—তাহাতেই অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ সে করিতে পারিবে। এখন ভাল দেখিয়া একটি বধূ যোগাড় করিয়া শ্যামলের বিবাহ দিতে হইবে। তাহাও করিবেন ঐ রাজীব অধিকারী। শ্যামলের সব কিছু তিনিই করিয়া থাকেন।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু ঐ মেয়েটি—ঐ মীনু উহার সহিত শ্যামলের বিবাহ দেওয়া যায় না। চমৎকার মেয়ে! কে জানে এতো ভাগ্য তাহার হইবে কি না। হইলে কিন্তু সত্যি ভাল হয়। অমন সুন্দর মেয়ে কমই দেখিয়াছে পদ্মা।

কিন্তু এসব আকাশ-কুসুম—পদ্মার পুত্রের পরিচয় নাই। কোন ভদ্রলোক তাহার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হইবেন না। তার চেয়ে আরও বড় কারণ, পদ্মা দরিদ্র। দানে তাহার দিন চলিয়া থাকে। শ্যামল এখনও রোজগার করে নাই। কবে করিবে কে জানে! তবে পড়াশুনায় সে খুবই ভাল, আর চেহারাও খুব সুন্দর। এইসব কারণে অনেক বড়লোকের নজর আছে তাহার দিকে।

কিন্তু পদ্মা যেন মনে একটি বিশেষ আশা পোষণ করিতেছে। সেটি অন্য কিছু নহে—মীনুকে পুত্রবধুরূপে লাভ করা। কিন্তু মীনু সত্যই কাহার কন্যা—কি তাহার সত্য পরিচয়? কিছুই জানা নাই পদ্মার। অবশ্য রাজীব অধিকারী নিশ্চয় জানেন—কিন্তু তিনি কি মীনুর বাবাকে রাজী করাইতে পারিবেন পিতৃপরিচয় হীন এক পাত্রের সহিত কন্যার সহিত বিবাহ দিতে? কে জানে! উহারা ফিরিলে পদ্মা জিজ্ঞাসা করিবে।

পত্র তো আসিয়াছে—শীঘ্রই আসিবেন রাজীব। কিন্তু যতক্ষণ না ফেরেন পদ্মা নিশ্চিতে ঘুমাইতে পারে না। সেদিনের চোরের ব্যাপারটার রহস্য যেন বুঝিয়া ফেলিয়াছে সে। উহা যে রামেশ্বরের কীর্তি তাহাতে পদ্মার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ চুরি করিবার মত কিছুই নাই তাহার ঘরে যে চোর আসিবে। রামেশ্বর নিশ্চয় জানিয়াছেন পদ্মা এখনো বাঁচিয়া আছে এবং এখানেই আছে। তাই পদ্মাকে ইহধাম হইতে বিদায় করিবার জন্য রামেশ্বর লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

পদ্মা কোনদিন যদি আদালতে যায়—এই তাঁহার আশঙ্কা—কিম্বা পদ্মা যদি তাহার পুত্র শ্যামলকে লইয়া রামেশ্বরের স্বামীত্ব দাবী করে এবং শ্যামলকে পুত্র বলিয়া প্রচার করে তবে রায় রামেশ্বরের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে—এই আশঙ্কাও কম নহে।

কিন্তু পদ্মা যতদূর জানে—রামেশ্বর বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নী সর্পাঘাতে মারা যায়, তাহার একটি কন্যা ছিল। রামেশ্বর আর দার পরিগ্রহ করেন নাই। কে জানে করিয়াছেন কি না—পদ্মা কোন খবর রাখে না।

কিন্তু আজ খবরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে পদ্মার। যদি রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার না করেন তবে কি হইবে! কোন পরিচয়ে শ্যামল জনসাধারণে পরিচিত হইবে!

চিন্তাটা অগাধ হইয়া উঠিল পদ্মার। কিন্তু সে সমস্ত দুর্বলতা ঝাড়িয়া

www.boiRboi.blogspot.com

ফেলিল—শ্যামল এতকাল যে ভাবে পরিচিত হইয়াছে, প্রফেসার রাজীব অধিকারীর পুত্র বা পালিত পুত্ররূপে—তাহাই থাকিবে। ইহার জন্য চিন্তার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।

অবশ্য একবার শেষবারের মত পদ্মা রামেশ্বরকে প্রশ্ন করিবে—পুত্রকে স্বীকার করিতে তিনি সম্মত কি না—যদি তিনি সম্মত না হন—হইবেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না—তবে পদ্মা আর সে চেষ্টা করিবে না। শ্যামল প্রফেসার অধিকারীর পালিত পুত্ররূপেই আত্মপরিচয় দান করিবে···শ্যামল অবশ্য সবই জানিবে। তাহাকে সবই জানাইবে পদ্মা কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইবেন—শ্যামল যেন তাহার পর কোনদিন আর রামেশ্বরের পিতৃত্ব কামনা করিতে না যায়।

বাহিরে কে যেন ডাকিতেছে। পদ্মা দরজা খুলিয়া দেখিল—মীনু ও শ্যামল।

শ্যামল ও মীনু চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—মা—মাগো—মা, দরজা খোল—আমরা এসেছি।

তাড়াতাড়ি প্রদীপ রাখিয়া মা দরজা খুলিয়া দিল। মীনা অগ্রেই আসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামল পশ্চাতে।

—মা—আমরা ফিরে এলাম, মা—মা—মা!

—চুপ—আমার মায়ের উপর ভাগ বসাতে এসেছে—দেখো মা।

—খুব কররো—ভাগ বসাবো। মা—ওমা—মাগো—মা—ওমা—

—ভালো হচ্ছে না কিন্তু—আমি কাকে মা বলবো তা হলে!

পদ্মা হাসিয়া বলিল—দেশমাতাকে মা বলবি—খোকন। এখন থেকে দেশমাতৃকাকে তুই মা বলিস, আর আমি মীনুর মা হয়েই থাকবো।

—আশ্চর্য করলে মা, তুমি! ভয় করছে না তোমার? তুমি এই ক'দিনে এতখানি সাহস কি ক'রে পেলে মা?

—সাহস আমার চিরদিনই দুর্জয় খোকা এতকাল তার প্রকাশ ছিল না; তুই বড়ো হয়েছিস—আমার দায়িত্ব থেকে এবার আমি মুক্ত হতে চাই। আয়···ঘরে আয় বাবা!

মীনাকে সস্নেহে টানিয়া একটা কক্ষে লইয়া গেল পদ্মা। শ্যামল অন্য কক্ষে বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিতে গেল। শূন্য উঠানে দীপশিখা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন প্রফেসার অধিকারী। দুইজন মুটে ব্যাগ সুটকেশ ও বেডিং রাখিয়া গেল। প্রফেসার অধিকারী উঠানের এককোণে রাখা একটা মোড়ায় বসিয়া একটা চুরুট ধরাইলেন। পকেট হইতে একটা নোট-বুক বাহির করিয়া কি কয়েকটা লিখিলেন। তারপর ডাকিলেন—

—শ্যামল!

www.boiRboi.blogspot.com

শ্যামলের মা বাহির হইয়া নমস্কার করিল।

বলিল—ওরা দু'জনেই স্নান করছে। কাপড় ছাড়া হলে কিছু খেতে দেব। আপনিও স্নান করে কাপড় ছাড়ুন, কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রফেসার অধিকারী বলিলেন,—না—না—কিছু দরকার হবে না। আমি বরং ঘণ্টা দুই পরে এসে মীনুকে নিয়ে যাবো। ওরা থাক—খাওয়া-দাওয়া করুক।

—বাড়ীতে তো আর আপনার জন্যে কেউ রেঁধে রাখেনি!

—তা হোক—চাকর-বাকর আছে। অন্য একটা কথা বলতে আপনার কাছে এসেছিলাম।

—বলুন!

শ্যামল বোধ হয় তার বাবার নাম জানতে চাইবে, বলবেন না আপনি—ওতে বিপদ আছে।

—জানতে চেয়েছিলো—আমি বলিনি সেদিন, কিন্তু আবার যদি জিজ্ঞেস করে—

—না, কোন রকমেই বলবেন না। আমি চললুম।

—আমার ইচ্ছে, আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করি—

—রামেশ্বরের সঙ্গে? —তা মন্দ কথা নয়—তাই করুন। তবে ফল কতটা হবে কে জানে।

প্রফেসার চলিয়া গেলেন।

—ও খোকা—আয় বাবা, খাবি।

শ্যামল নিকটে আসিয়া বলিল,

—প্রফেসার অধিকারীর সঙ্গে তুমি চক্রান্ত করেছ মা। আচ্ছা মা, যা গোপন আছে—তা গোপনই থাক। আমি শুনতে চাই না।

—চুপ কর খোকা মীনু রয়েছে। সব কথাই তোকে যথাসময়ে বলে যাবো। তোর মা এমন কিছুই পাপ বা অকর্ম করেনি, যা শুনে তোর লজ্জার কারণ ঘটবে। এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি তোকে বুকে নিয়ে তোর বাবার আসার আশায় বসে আছি। আমার এই একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ ধন তুই—এই গর্ব যেন তোকে পৃথিবীর বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শক্তি দেয়!

—সে শক্তি আমি পেয়েছি মা—তোমার অমোঘ আশিস ফলেছে আমার জীবনে। আমি দানব পিতার সন্তান, তবু আমি মানুষ হবো—ধ্রুব যেমন অসুরকুলে জন্মেও তার ধ্রুবকে হারায় নি। কিন্তু তাকে আমি সঠিকভাবে জানতে চাইছিলুম মা।

—আরো কিছুদিন যাক বাবা।

www.boiRboi.blogspot.com

—আচ্ছা মা—যাক্। যদি কোন দিন জানতে পারি কে সেই শয়তান পিতা, যে আমার চিরদুঃখিনী মাকে এমন করে চোখের জলে ভাসিয়েছে—

—না থোকন! চোখের জল ফেলিনি আমি। তোকে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে আছি বাবা! তুই আমার মাতৃত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী, দেশমাতার হাতে তোকে দিতে পারবো—সেই আমার নারীজন্মের সার্থকতা!

কাপড় ছাড়িয়া মীনা আসিয়া দাঁড়াইল।

—চল মা—খাবি চল।

মা তাহাদিগকে খাইতে দিল।

রামেশ্বর মেদিনীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। তাঁহার মনে নানা দুর্ভাবনা জাগিতেছিল। কানাই ওখানে কি কতদূর করিল তাহা জানা দরকার। রামেশ্বর আর কাহাকেও হত্যা কবার ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কানাই নিশ্চয় তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

সকালে পৌঁছিয়াই রামেশ্বর নিভৃত কক্ষে কানাইকে ডাকিলেন। প্রভুর আদেশ পালন করিতে অক্ষম হওয়ার জন্য কানাইয়ের চিন্তার অবধি ছিল না। সে ভীত হইয়া ভাবিতেছিল—রামেশ্বর হয়তো তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিবেন—হয়তো চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবেন—কিম্বা কয়েক ঘা স্বহস্তে জুতা মারিবেন। তাই অতিশয় শঙ্কিত চিত্তে কানাই আসিয়া দাঁড়াইল। রামেশ্বর চুরুটটা মুখ হইতে না সরাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—ও কাজটার কতদূর?

—ও কাজটা এখনও শেষ হয়নি হুজুর—ওটা বস্তি হলেও খুব লোকজন ওখানে। আর উনি—মানে ঐ মেয়েটি অত্যন্ত সজাগসতর্ক—

—হয়নি তাহলে?

—এজ্ঞে না হুজুর—

—আচ্ছা—যা—আর দরকার নেই। ওটা আর করতে হবে না।

কানাই তাহার চাকুরী জীবনে এমন আর দেখে নাই। রায় রামেশ্বরের আদেশ পালিত হয় নাই—তবুও অপরাধীকে তিনি কিছুই বলিলেন না—ইহা কানাই-এর চাকুরীজীবনে এই প্রথম। সে যেন বাঁচিয়া গেল—এমনি তাহার অবস্থা—কানাই চলিয়া আসিতেছিল। রামেশ্বর ডাকিলেন—শোন—

কানাই দাঁড়াইল। রামেশ্বর বলিলেন—ওদিকে আর যাবি না—বুঝলি?

—যে আজ্ঞে হুজুর।

—এখন আর একটা কাজ করতে হবে—দয়ালকে ডাক।

কানাই তৎক্ষণাৎ দয়ালকে ডাকিয়া আনিল। রামেশ্বর তাহাকে বলিলেন

www.boiRboi.blogspot.com

—শোন দয়াল—শীঘ্রই আমি দেশে যাব। তোমরা আগে, আজই চলে যাও —সেখানে তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।

—আদেশ করুন।

—রাজীব হয় তো এখনো মেদিনীপুরেই আছে। আরো অন্ততঃ তিন-চার দিন থাকবে। তারা না ফেরা পর্যন্ত আমাকে এখানেই থাকতে হবে। মীনুকে নিয়েই আমি ফিরতে চাই। নইলে দেশে গিয়ে কি কৈফিয়ত দেশের লোকদের দেবো!

—সেকথা নিশ্চয় সত্য হুজুর।

—আমি কোনদিন কারো কাছে হার স্বীকার করিনি দয়াল। তোমার জান —কিন্তু ঐ রাজীব আমাকে হারিয়ে দেবে—এ হতে পারে না। যেমন করে হোক মীনুকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। আদালত নয়—আইন নয়—গায়ের জোরও ওখানে ঠিক কাজ করছে না—

—তা হলে হুজুর কি করা যায়? দয়াল প্রশ্নটা করিয়াই রামেশ্বরের মুখপানে তাকাইল।

—তোমাদের আর এখানে কিছু করতে হবে না—বাড়ী যাও। দেশে গিয়ে বলবে—আমি মীনুর বিয়ের চেষ্টা করছি। ভাল পাত্র যোগাড়ের জন্যই তাকে কলকাতায় এনেছি! এখানকার বড়লোকেরা দেশেগ্রামে গিয়ে মেয়ে দেখতে চান না—তাই কলকাতায় মীনুকে আনা হয়েছে। বুঝলে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ—হুজুর। এ তো সোজা কথা! কিন্তু হুজুর····

—কি বলো!

—ঐ রাজীব যদি মীনুকে না দেন তো একা আপনি কি করবেন এখানে?

—আমার মেয়ে—দেবে না কি?—না-না-না, সেরকম কোন মতলব নেই নেই রাজীবের। রাজীব তাকে চুরি করেছে কেন তা বোঝা গেছে। মীনু আমার একমাত্র কন্যা। আমার সম্পত্তির আয় কয়েক লক্ষ টাকা—মীনুই তার মালিক। রাজীব চায় মীনুকে হাত করার পর নির্বাচিত কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার সর্বস্ব অধিকার করে নিতে। সে-সবই রাজীব ঐ দান-খয়রাতে খরচ করবে। বুঝলে, রাজীব মহান হতে চায়—মহামানব হতে চায়। নিজের টাকা তো সব দিচ্ছেই—এখন আমারটাও অধিকার করতে চায়।

—তা হতে পারে হুজুর—কিন্তু আমাদের দিদিমণি তো খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—

—হ্যাঁ—তাতে কি! রাজীব তাকে বুঝিয়েছে—ঐসব নোংরা কাজই পৃথিবীতে নিদারুণ ভাল কাজ—অবতার হবার কাজ! কিন্তু শোন দয়াল, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না—মীনুর বিয়ে হবে কোনো রাজকুমারের সঙ্গে!

www.boiRboi.blogspot.com

—সে তো নিশ্চয় হুজুর!

—হ্যাঁ—তোমরা যাও—আজই সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী চলে যাও তোমরা।

—যে আজ্ঞে—

দয়াল ও কানাই চলিয়া গেল। কিন্তু রামেশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলেন—দয়াল ও কানাইকে যেকথা তিনি এখনই বলিলেন তাহার বর্ণমাত্রও সত্য নহে। রাজীব কেন মীনুকে আনিয়াছে—তাহা রামেশ্বর ভালরূপেই জানেন। কিন্তু সেই সব সত্য কথা বাইরে প্রকাশ করা অসম্ভব। মীনু তাঁহার বিবাহিত পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে এই সত্য তাঁহার জমিদারীর সকলেরই জানা। অতএব মীনু যে তাঁহারই কন্যা—ইহা সর্বলোক বিদিত।

রাজীব আজ তাঁহাকে দাবী করিতে চাহে—যদি করে তবে রামেশ্বরের কাছে একটি মাত্র দরজা খোলা থাকিবে—আত্মহত্যা। কারণ, এতকাল পরে নিজ জীবনের সেই গ্লানিকর অধ্যায়কে প্রকাশ করার ব্যথা সহ্য করিতে পারিবেন না তিনি।

তা ছাড়া মীনুকেই কি তিনি ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন? অসম্ভব। মীনু তাঁহার কেহ না হইয়াও যে সব। মীনু যে তাহার বুকজোড়া ধন—চোখ-জোড়া আলো।

রায় রামেশ্বরের চোখে জল আসিতেছে নাকি! হ্যাঁ—জলই। মনে পড়িল ছোরা হাতে রামেশ্বর গিয়াছিলেন মীনুকে হত্যা করিতে। মীনু তারস্বরে ঘোষণা করিল—"আমার বাবা রায়বাহাদুর রামেশ্বর রায়। আমার বাবা—আমার বাবা রায় রামেশ্বর···"

ওঃ! রায় রামেশ্বর নিজেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার বাবা—আমার বাবা—' যেন মীনুর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। আত্মসংবরণ করিতে সময় লাগিল তাঁহার। আপন মনে বলিলেন—হ্যাঁ মা—হ্যাঁ—রায় রামেশ্বরই তোর বাবা! বাবা কি শুধু জন্ম দিলেই হয়? না—বাবা হওয়ার জন্য অনেক কিছু লাগে। বুকের রক্ত লাগে, চোখের জল লাগে, সুদুরূহ আত্মত্যাগ লাগে··

রায় রামেশ্বরের মনে পড়িতেছে—অসুস্থ মীনুর জন্য ডাক্তার রক্ত দিবার কথা বলিলেন। রায় রামেশ্বর রক্ত কিনিলেন না—নিজের ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তিনি—হ্যাঁ—রায় বংশের রক্ত—রায় রামেশ্বরের রক্ত—আছে ঐ মীনুর শরীরে—আছে—আছে!

উল্লাসে লাফাইয়া লঠিলেন রায় রামেশ্বর। আপন মনে বলিতে লাগিলেন—মীনু আমার মেয়ে—আত্মজা কন্যা। কার সাধ্য তাকে ছিনিয়ে নেয়?—রাজীব কি তার করেছে—কী করেছে রাজীব তার? কোনদিন কোন খবরও কি

www.boiRboi.blogspot.com

রেখেছে। তার প্রতিপালন, তার শিক্ষা-সহবৎ—তার আচার-আভিজাত্য—কি আর দেখেছে রাজীব? আজ এসেছে দাবী করতে। করলেই হোল! বাবা হওয়া অত সোজা কিনা!

নাঃ—এভাবে পারিবেন না রায় রামেশ্বর বাঁচিতে। মদের বোতলটা বাহির করিলেন—ছিপি খুলিলেন—পান করিবেন। মীনু এটা পছন্দ করে না। মদ খাওয়া সে কোনদিন ভাল চোখে দেখে নাই। নাঃ—মদ আর খাইবেন না রায় রামেশ্বর। বোতলটা জানালা দিয়া ফেলিয়া দিলেন।

মীনু বড় হইয়াছে। বিবাহ দিতে হইবে। এখানেই কোন একটি ভাল ছেলে দেখিয়া মীনুর বিবাহ দিয়া মেয়ে-জামাই লইয়া রামেশ্বর দেশে যাইবেন। তাহা করিতে পারিলেই মীনুকে চুরি করিয়া আনার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যাইবে। দেশে গিয়া ভালরকম ভোজ খাওয়াইয়া দিবেন সকলকে। ভাল যাত্রা শুনাইয়া দিবেন গ্রামবাসীদের—এবং কবিগানও। মীনু কবিগান ভালবাসে। হ্যাঁ—কবিগান তাহার বিবাহে অবশ্যই করাইতে হইবে। রাজীবকে কথাটা বলা দরকার। হ্যাঁ—রাজীবের হাতে অনেক ভাল ছেলে আছে।

কিন্তু রাজীব মীনুকে দিবে না বলিয়াছে। রাজীব মীনুকে দিয়া সমাজ-সেবা করাইবে। দেশের কাজ করাইবে—হয় তো রেডক্রশে যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিবে। কে জানে কি করিতে চায় রাজীব তাহাকে লইয়া। কিন্তু রামেশ্বরের যে আর কেহ থাকিবে না—কিছুই থাকিবে না—না-না—মীনুকে যেমন করিয়াই হোক বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে।

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল—একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে হুজুর।

কে আবার আসিল! রামেশ্বর তো কলকাতায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া আছেন! কাহাকেও জানান নাই যে তিনি এখানে আসিয়াছেন। কলিকাতায় বহু বন্ধু এবং বহু পরিচিত তাঁহার—কিন্তু তাঁহারা কেহই রামেশ্বরের এখানে আগমনবার্তা জানেন না। কে আসিল তবে?

—ডাক—আসতে বল।

অল্পক্ষণ পরে যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি রামেশ্বরের বিশেষ পরিচিত বন্ধু ডাক্তার সোমনাথ চৌধুরী। রামেশ্বর ব্যস্তভাবে বলিলেন—

—আরে, তুমি! এসো···এসো···এসো—কেমন আছ সব?

—ভালই! কিন্তু তুমি হঠাৎ কলকাতায় কেন? মীনু কি বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি?

—না। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার বিয়ে দিতে হবে।

—খুব ভাল কথা! তা কোথায় সে? এনেছ এখানে?

www.boiRboi.blogspot.com

—হ্যাঁ। তবে গেছে একটু বেড়াতে। আমার বন্ধু রাজীব—চেন তো?

—প্রফেসার রাজীব অধিকারী? হ্যাঁ—ওকে কে না চেনে। সাপের বিষের ওষুধ বার করলো—আবার ঐ বিষ নিয়ে কি সব জটিল রোগের ভাল ভাল ওষুধ বার করেছে। ও তো সর্বজন-পরিচিত। কিন্তু প্রফেসার রাজীব তো শুনেছি চিরকুমার! কে কে আছে তাঁর বাড়ীতে?

চিরকুমার ঠিক নয়। আছে কেউ, অন্ততঃ ছিল—ওসব যুবা বয়সের ভালবাসার ব্যাপার। যাক্—রাজীব মীনুকে মেয়ের মত ভালবাসে। সে গেছে মেদিনীপুর বন্যাত্রাণ করতে। তার আরো সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে মীনাকেও নিয়ে গেছে। দু'তিন দিন পরে ফিরবে ওরা····

—বেশ! বস! আমি রুগী দেখে ফিরছিলাম—দেখি তোমার দরজায় 'রায় রামেশ্বর ইন্' লেখা। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তুমি এসেছ। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। অনেকদিন দেখা হয় নি।

—খুব ভাল করেছ। আর কি খবর বলো।

—খবর তো আপাততঃ ভালই। ছেলেটা আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া থেকে ডাক্তারী ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে মাস দুই হোল। প্র্যাক্‌টিশও এরই মধ্যে জমিয়ে ফেলেছে। এখন তাঁর মার ইচ্ছে বিয়ে দেওয়ার····

—বেশ তো—ভাল একটি মেয়ে দেখো····

—মেয়েও দেখা আছে আমার চমৎকার মেয়ে—এখন মেয়েপক্ষের মত হলেই হয়!

—মত না হবার কোন কারণ নেই। তুমি ভাল, তোমার ছেলে ভাল, অমতের আশঙ্কা করছো কেন?

—শোন তা হলে! জমিদারী আজ না থাকলেও তুমি পুরোণো জমিদার-ব্যক্তি। তাই সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে—বলি তা হলে কথাটা।

রামেশ্বর কি যেন ভাবিলেন। কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া বলিলেন—বল—সঙ্কোচ কেন?

—মেয়ে আমাদের পছন্দই আছে। তোমারই মেয়ে মীনু!

রামেশ্বর ডাঃ সোমনাথের পানে তাকাইলেন এবং বেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়াই রহিলেন। কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না।

—আশা করি তোমার অমত হবে না রামেশ্বর!

—না। আমার অমতের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু সোমনাথ, মীনু আমার মা-মরা মেয়ে। তাকে চোখের আড়াল করতেও পারিনে আমি। তার বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই মনে হয় সব আমার অন্ধকার হয়ে যাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

—সেকি রামেশ্বর! একটু আগেই বলেছিলে মীনুর বিয়ে দিতে হবে।

—হ্যাঁ! বিয়ে তার দিতে হবে সোমনাথ! দিতেই হবে—কিন্তু····

—কি বলো!

রামেশ্বর কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ইতিমধ্যে চা-খাবার আসিল। রামেশ্বর উত্তর দিতেছেন না। ডাঃ সোমনাথ কিছুটা আশ্চর্য কিছুটা বিরক্ত ভাবে বলিলেন—তোমার অসুবিধেটা কোথায়?

—শোন সোমনাথ। তোমার ঘরে মেয়ে দেওয়া আনন্দের এবং গৌরবের কথা। কিন্তু কি জান! আজকালকার বড় বড় ছেলেমেয়ে! তাদের মত না নিয়ে কিছু করা যায় না। মীনু ফিরে আসুক, তার মত নিয়ে তবে আমি এগুবো।

—বেশ! বেশ! এ খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার মতলব শোন। মীনু ফিরলে ওকে নিয়ে একদিন বিকালে এসো আমার বাড়ী! ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে নিই—সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার ছেলেকে দেখে অপছন্দ করবে এমন মেয়ে তো দেখিনি।

পুত্র-গর্বে ডাঃ সোমনাথের মুখ জ্যোতির্ময় দেখাইতেছে।

রামেশ্বর অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। কি বলিবেন তিনি! অনেকক্ষণ চিন্তা করিবার সময় নাই। ডাঃ সোমনাথ তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং আরো বড় কথা—মীনুর অসুখের সময় এই সোমনাথই চিকিৎসা করিয়া মীনুকে ভাল করিয়াছিলেন। তখন হইতেই মীনুকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা ডাঃ সোমনাথের। কিন্তু আজ মীনু তো রাজীবের কন্যা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য রাজীব মীনুর বিবাহ নিশ্চয় দিবে কিন্তু তাহাতে রামেশ্বরের কি! রামেশ্বর সেখানে কেহই হইবে না। রামেশ্বরের বিপুল বিত্ত কে ভোগ করিবে কে জানে! রাজীবের শেষ বিদ্রূপটা মনে পড়িল। "আসবে তো?"—উঃ, রায়বাহাদুর রামেশ্বরকে কী কঠোর বিদ্রূপ করিয়াছে রাজীব! ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই লইতে হইবে। মীনুকে চুরি করিয়া অথবা অন্য যে কোনো রকমে হউক রামেশ্বর লইয়া যাইবেন—কিন্তু এটা সহর কলিকাতা—এখানে রাজীবের অগাধ প্রতিপত্তি····

—কথা বলছো না কেন রামেশ্বর? তোমার কি অমত আছে।

—না। অমতের কোন কথাই নাই সোমনাথ। তবে কি জান। আজকাল-কার বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে; দেখাশোনা এবং আরও কিছুটা এগিয়ে যাবার পর যদি কোন কারণে বিয়ে না হয় তো বিপদ ঘটে! যাই-হোক মীনু ফিরে আসুক—দেখি আমি কি করতে পারি!

—বেশ, তাই করবে। খবরটা কবে নাগাদ জানতে পারবো আমি?

—ওরা খুব সম্ভব দিন চারপাঁচ পরে ফিরবে। তোমাকে ফোন্ করে জানাব।

—আচ্ছা। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা মীনুকেই পুত্রবধূ করে আনবো বাড়ীতে। এখন তোমার আর তোমার মেয়ের মত····

—তোমার ছেলের মতামত? সে আবার বিগড়াবে না তো!

—সে সব ঠিক আছে। আমার ছেলে ওবিষয়ে প্রাচীনপন্থী। বাপমার উপর সে কোন কথা বলবে না। অবশ্য সে জানে আমরা তার জন্য যোগ্যতমাকেই নির্বাচন করছি।

রামেশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। ডাঃ সোমনাথ সিগারেটটা এ্যাষ্ট্রেতে ফেলিয়া দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিলেন,

—তা হলে ঐ ঠিক রইল—কেমন!

—হ্যাঁ—ঐ ঠিক রইল।

ডাঃ সোমনাথ চলিয়া গেলেন। বসিয়া রহিলেন রামেশ্বর রায়। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেছেন তিনি:

সারা পৃথিবী জানে—অতুল সম্পদের অধিকারী রায় রামেশ্বরের একমাত্র কন্যা মীনাক্ষী। পরমাসুন্দরী সর্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা সে—তাহাকে যে বিবাহ করিবে—সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে। ডাঃ সোমনাথ ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। গরীবের ছেলে সোমনাথ ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চাকুরী করিয়া ও প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করিয়া বাড়ী একখানা করিয়াছেন এবং ছেলেটিকেও ডাক্তার করিয়াছেন—কিন্তু আর কি! ডাঃ সোমনাথ মীনুকে পুত্রবধূ করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন—বাংলাদেশে এ ব্যাপার একান্ত বিরল। মীনু তাঁহার এমন অপরূপ কন্যা যে····কিন্তু থামিলেন রামেশ্বর। মীনু আর তাঁহার কন্যা নহে—না—কেহই নহে মীনু তাঁহার। ওঃ—রামেশ্বর কাঁদিয়া উঠিলেন যেন····মীনু তাঁহার কেহ নহে—এ চিন্তা কিরূপে করিতেছেন রামেশ্বর! মীনু যে তাঁর চক্ষের মণি—বক্ষের শোণিত—অন্তরের অন্তঃস্তলের ললিত-লাবণ্য!

মীনুকে ছাড়িয়া রামেশ্বর বাঁচিবেন কিরূপে! না—মীনুকে তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। প্রয়োজন হইলে রাজীবের পায়ে ধরিয়াও তিনি মীনুকে গৃহে লইয়া যাইবেন—মীনুর পিতারূপে তাঁহার পরিচয় চিরদিন বহাল থাকিবে—ইহা করিতেই হইবে। রাজীব উদার—রাজীব—মহান—নিশ্চয় রাজীব মীনুকে ছাড়িয়া দিবে রামেশ্বরের নিকট। রাজীবের বিস্তর আছে ছাত্র-ছাত্রী—আছে বিদ্যা-বুদ্ধি-গবেষণা—আছে নাম যশ—কিন্তু রামেশ্বরের কি আছে! একমাত্র সম্বল ঐ মীনু।

কে যেন আসিতেছে! রামেশ্বর ত্বরিতে চোখ মুছিয়া লইলেন।

—কে? কে? কে?—কে ওখানে?

রামেশ্বর আবার ভূত দেখিতেছেন নাকি? না—ভূত নয়। নিশ্চয় কেহ আসিয়াছে। রামেশ্বর পুনর্বার চীৎকার করিলেন—কে—? দয়াল!

একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বিস্মিত রামেশ্বর চাহিয়া রহিলেন। যেন চিনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না।

স্ত্রীলোক বলিল—দয়াল বাইরে গেছে।

রামেশ্বর তাহার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—কে তুমি—তুমি কে?

—আমি? আমি কে চিনতে পারো না? অনেক দিন পরে এসেছি, তবু চিনতে পারবে—দেখো!

স্ত্রীলোকটি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল।

রামেশ্বর চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন,

—পদ্মা! কোথায় ছিলে তুমি এতদিন?

—জাহান্নামে—যেখানে তুমি যেতে বলেছিলে?

—বেশ, সেইখানেই যাও—আমার কাছে কেন?

—দরকার আছে—আমার মত অনেক মেয়েকে পথে বসিয়েছ তুমি, জান। ও-শরীরে অনুতাপের আগুন কোন দিন জ্বলবে না—তাও জানি। তাই জানতে এসেছি, হে আমার প্রাণেশ্বর—তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে কোনদিন আসবো না। প্রিয়তম আমার! মনে আছে কি, আমার গর্ভে তোমার সন্তান ছিলো?

এই কঠোর বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতে সময় লাগিতেছে। রামেশ্বর একটু থামিয়া শুধাইলেন,

—হ্যাঁ—কোথায় সে? সে কি বেঁচে আছে?—যেন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন রামেশ্বর।

—আছে—এই পৃথিবীর এক অন্ধ গহ্বরে আছে। পরিচয়হীন পথের কাঙাল হয়ে—

—পরিচয়! পরিচয় কি দেবে তুমি তার?

—সেইটুকুই জানতে এসেছি। আজ সে বড় হয়েছে। তার পিতৃপরিচয় জানতে চায়—জানতে চায় তার ভীরু কাপুরুষ পিতা কে?

—গালমন্দ দিয়ে কিছু লাভ নেই পদ্মা, তার পিতৃপরিচয় পৃথিবীতে অজ্ঞাতেই থাকতে দাও। তাকে বাঁচিয়ে রেখে এই বিড়ম্বনায় ফেলেছ তুমি।

—ঠিক—নিজের ছেলেকে যে নিজের বলে পরিচয় দিতে ভয় পায়, তার পিতৃত্বও যেন আমার ছেলে কামনা না করে। কিন্তু জেনে রেখো, তাকে গ্রহণ

www.boiRboi.blogspot.com

করলে তোমার মুখ, তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হোত। কিন্তু থাক—চললাম।

পদ্মা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রামেশ্বর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কি যেন একটা ঘটিয়া গেল তাঁহার, অন্তরে—কে যেন একটা না-ছোঁয়া তারে ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়া গেল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়া আপন মনে রামেশ্বর বলিলেন—রায়বংশের একজন আছে তাহলে। কিন্তু রায়বংশের সে কেউ হতে পারবে না। আশ্চর্য দৈববিড়ম্বনা। পদ্মা—পদ্মা।

কানাই আসিয়া দাঁড়াইল।

রামেশ্বর বলিলেন—একটি মেয়ে এসেছিল—ডাক তাকে।

—তিনি চলে গেছেন হুজুর।

—এর মধ্যে চলে গেছেন! দেখ—দেখ বাইরে।

কানাই দ্রুত চলিয়া গেল।

রামেশ্বর আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, রাজীব যদি এতকাল পরে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাতা কন্যাকে নিজের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে পারে—ত হলে আমিই বা কেন পদ্মার ছেলেকে·····কিন্তু রাজীব থাকে কলকাতায়—এখানে কে কার খবর রাখে। আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে হবে—না—এ অসম্ভব। কানাই।

কানাই প্রবেশ করিল রামেশ্বর বলিলেন—গাড়ী বের করতে বল—বেরুবো।

রামেশ্বর পিরাণ লইয়া পরিতেছেন। কিন্তু কোথায় বাহির হইবেন তিনি? কোনো নির্দিষ্ট স্থান তো নাই। কোথাও কোন কাজও নাই তাঁহার কাজ যাহা আছে একটি মাত্র। মীনুকে ফিরাইয়া আনা। তাহারই জন্য হয়তো কোথাও যাইবেন—কিন্তু কোথায়?

অকস্মাৎ রাজীব প্রবেশ করিলেন।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রামেশ্বর বলিলেন—রাজীব? আমার বাড়ীতে?

হ্যাঁ! আশ্চর্য হচ্ছ রামেশ্বর! কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় আছে। তুমি আজও অপরাজেয়।

—বিদ্রূপ করছো রাজীব?

—না বন্ধু! সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। তুমি চিরদিনই অপরাজেয় রইলে। ভদ্রা তোমায় ভালোবাসেনি, কিন্তু তার মেয়ে ভালবেসেছে, ভালবেসেছে বিশেষ এক জনকে। চলো—দেখবে চলো।

—মীনু ভালবেসেছে? বেশ! কি আর দেখবো? কে আমি তার! আমার বিরুদ্ধে তো তুমি তাকে—

উস্কে দিয়েছি। তুমি তার মার হত্যাকারী। তার বাবার জীবনের দারুণ

www.boiRboi66.blogspot.com

কুগ্রহ। তবু তুমি জয়ী হয়েছ।

—ভেঙে বলো রাজীব! সে কি ফিরে আসতে চায়?

—চলো, দেখবে—সে ভালোবেসেছে—ভালোবেসেছে দুর্দান্ত নরপশু রামেশ্বরের আত্মজ সন্তানকে। ভদ্রা যাকে ভালোবাসেনি, তারই ছেলেকে ভালোবাসলো ভদ্রারই মেয়ে। তোমার জয়-পতাকা দেখবে না রামেশ্বর?

—কে সে? কোথায় সে ছেলে আমার!

বিস্মিত রামেশ্বরের হাতের পিরাণটা হাতেই রহিয়া গেল।

রাজীব বলিলেন—শ্রীমান শ্যামল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। এবার সে প্রথম হয়েছে উচ্চতর বিজ্ঞানে—হয়তো স্টেট-স্কলারশিপ পাবে। রূপে-গুণে-বিদ্যায় তোমার ছেলে তোমাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে বন্ধু—চরিত্র-গৌরবে তুমি তার হাঁটুর সমানও নও!

—শ্যামল—শ্যামল পুত্র আমার! যে শ্যামলকে……তুমি সত্যি বলছো রাজীব! বিদ্রূপ করছো না তো এক অভাগা সন্তানহীন পিতাকে?

—না রামেশ্বর! তোমাকে আজো বন্ধু বলে মনে করি—তাই মানুষ করে তুলতে চাই। চলো, দেখবে—ভদ্রার মেয়ে মীনু তোমারই আত্মজ সন্তান শ্যামলকে কেমন গভীরভাবে ভালবাসে!

রামেশ্বর মিনিটখানেক নির্জীবের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন কোন মন্ত্রবলে। পরে বলিলেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে রাজীব—না, আর উপায় নেই। মীনু শ্যামলকে ভালবাসলো রাজীব! আনন্দের কথা। তুমি দেখো। তুমিই জয়ীর ইলে। রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় শ্যামলকে আজ পুত্র বলে স্বীকার করতে পারবে না। আমার অন্তরেই সে স্বীকৃত থাক—বাইরে সে আমার কেউ নয়—কেউ হবে না।

—বেশ! কিন্তু দেখতে চাও না তাদের?

—না, কোন প্রয়োজন নাই! কালই আমি দেশে যাচ্ছি।

—মীনুকে নিয়ে যাবে না?

রামেশ্বর একটুখানি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিলেন। পরে বলিলেন—মীনু যদি তোমার কাছে থাকতে চায় তো থাকবে কিছু দিন।

—আচ্ছা! ধন্যবাদ—বলিয়া রাজীব তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। মুখে তাঁহার হাসি।

রামেশ্বর আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—সারা জীবনটার উপর কালো যবনিকা টেনে দাও ভগবান্—যদি থাকো তুমি কোথাও!

সক্রোধে বাহির হইয়া আসিল পদ্মা রামেশ্বরের প্রাসাদ হইতে। কিন্তু তাহার

www.boiRboi.blogspot.com

বুকের ভিতরটা জ্বলিতেছে। নিরাশার মধ্যেও পদ্মা আশা করিয়াছিল, হয়তো রামেশ্বর শ্যামলকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। কারণ শ্যামল আজও সুন্দর সুপুরুষ যুবক—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ডিগ্রিধারী এবং প্রফেসার অধিকারীর গর্বের ধন। তাহাকে পুত্ররূপে পাইতে যে কোন পিতা আগ্রহান্বিত হইবেন—এই বিশ্বাস লইয়াই পদ্মা আজ সাহস করিয়া আসিয়াছিল এখানে। কিন্তু কি হইল? রামেশ্বর পুত্রের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না। সে কে? সে কেমন—কি করে—কতটা পড়িয়াছে—নাঃ, কিছুই জানিতে চাহিলেন না তিনি।—আশ্চর্য!

কিন্তু পদ্মা আর কি করিতে পারে! আদালত অবশ্য আছে। তবে এতোকাল পরে ওসব ঝামেলা আর করিতে চাহে না পদ্মা—তা ছাড়া আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে ওসব ব্যাপারে। রায় রামেশ্বর যে কোন মুহূর্তে শ্যামলকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিতে পারেন—সে চেষ্টাও হয়তো তিনি করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে শ্যামলের কোন সংবাদ তিনি জানিতে চাহেন নাই। কিন্তু শ্যামলকে কি বলিবে পদ্মা! প্রফেসর রাজীব অধিকারী সবই জানেন—তিনিই যাহা কিছু বলিবেন। পদ্মা কিছুই বলিবে না। প্রফেসর অধিকারী শ্যামলকে সর্বত্র 'অরফ্যান'—কুড়োনো ছেলে বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেই তাহার অভিভাবক হইয়াছেন। কারণ তিনি গোড়া হইতেই জানিতেন—রামেশ্বর পুত্রকে কোনদিন স্বীকার করিবেন না। এইজন্য প্রফেসার রাজীবই শ্যামলের অভিভাবক হইয়া আছেন। স্কুলকলেজে তাহার পিতার কি নাম আছে—আছে কি না পদ্মার জানা নাই—খুব সম্ভব শ্যামলের পিতৃনাম অজ্ঞাতই রহিয়াছে স্কুলকলেজে—কিন্তু এসব ভাবিয়া কি হইবে!

পদ্মা নিজেকে সম্বৃত করিয়া গৃহে ফিরিল। চিন্তায় মন তাহার জ্বলিতেছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র তাহার পিতৃপরিচয় জানিতে চায়। নিরপরাধী পদ্মা তাহা বলিতে পারিতেছে না—মনে হইতেছে, এ কালা-মুখ সে শ্যামলকে আর দেখাইবে না। বহুবার তাহার আত্মহত্যা করিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়াছে—শুধু শ্যামলের মুখ চাহিয়াই পদ্মা এযাবৎ নিজেকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

শ্যামল ঘরেই ছিল—পদ্মা আসিতেই অভিমানের সুরে বলিল—কোথায় গিয়েছিলে মা?

—এই একটু ওবাড়ী গিয়েছিলাম বাবা—এখনও পড়তে যাস নি তুই?

—ওখান থেকেই আসছি মা—প্রফেসর অধিকারীই পাঠালেন। শোন মা—একটা সুখবর আছে। আমি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছি—বিজ্ঞানের বড় পরীক্ষা মা—বুঝেছ।

—ভগবান আশীর্বাদ দান করুন—বলিয়া সর্বাগ্রে পদ্মা গিয়া তুলসী মঞ্চতলে

www.boiRboi.blogspot.com

প্রণাম করিল ও ফিরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—প্রফেসর অধিকারী জানেন ?

—হ্যাঁ মা—তিনি নিশ্চয় জানেন। আরো সবাই জানবে মা—কাল কাগজে ছাপা হয়ে যাবে—আমার ফটোশুদ্ধ। দেখবে তুমিও। কিন্তু মা—

—কি ? বল।—

পদ্মা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল। সে যেন বুঝিয়াছে, কি প্রশ্ন শ্যামল করিবে। শ্যামল বলিল— কাগজে ছাপবার জন্য প্রফেসর অধিকারী প্রেসের লোককে একটা নোট লেখালেন—

—বেশ তো—কি লেখালেন ?

—লেখালেন—"শ্রীমান শ্যামলকুমার রায় এই বৎসর বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান শ্যামল বাংলার এক বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সন্তান—তাহার প্রাচীন পিতৃবংশের গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়—অতি শৈশবে শ্যামল পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে আজ সে ছাত্রমণ্ডলীতে উচ্চ স্থান লাভ করিল—তাহা সত্যই গৌরবময়। আমরা শ্রীমানের দীর্ঘজীবন ও সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি—"

—বেশ তো লিখেছেন।

—হ্যাঁ—কিন্তু মা—আমি কি সত্যি কোন জমিদারের ছেলে ?

—ও নিয়ে আর গর্ব করার কিছু নেই শ্যামল—জমিদারবংশ লুপ্ত আজ। আর জমিদার বংশ বহু সময়েই অত্যাচারী বংশ। জমিদারের ছেলে বলে আজ আর কোন সম্মান কেউ আদায় করতে চায় না শ্যামল। প্রফেসর অধিকারী ওসব একটু বাড়িয়ে লিখেছেন। ও নিয়ে তুই মাথা ঘামাস নে।

—না মা—কিন্তু আমার পিতৃপরিচয় জেনেও তিনি গোপন করলেন কেন ?

—কারণ তুই তোর মার ছেলে, তুই বাংলামার—ভারতমাতার পুত্র। তোর বাপের পরিচয়ে গৌরবের কিছু নেই থোকন—সে জানবার তোর কোন দরকার নেই।

শ্যামল মাকে উত্তেজিত দেখিয়া আর কিছুই বলিল না। কিন্তু মনে তাহার অদম্য পিপাসা জাগিয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা কে ? কেমন তিনি—যিনি পুত্রকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। কোথায় তাঁহার বাধা!—কিন্তু শ্যামল আর কোন কথা বলিতে চাহে না। একটা রহস্য কিছু তার জন্ম ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত আছে ইহা শ্যামল বহুদিন হইতেই জানে। এতদিন সে নিজেকে 'অরফ্যান' বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু 'অরফ্যান' সে নহে। তাহার মা তো আছেই—বাবাও আছেন। এই বস্তিতে মা কি বলিয়া স্বামীর

www.boiRboi.blogspot.com

পরিচয় দেয়—শ্যামল জানে। মা বলে তাহার স্বামী আবার বিবাহ করায় পদ্মা চলিয়া আসিয়াছে। যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না তাহাকে তাহার পুত্রের পিতা বলিয়াও পরিচয় দিতে চাহে না পদ্মা—অনেক অনেক কিছু ভাবিয়াছিল—কিন্তু সে সব বহু দিনের কথা। উহা লইয়া এখন আর কেহ কোন প্রশ্ন করে না।

—আয়—চা খা।

শ্যামল ফিরিয়া দেখিল, পদ্মা চোখের জলটা আঁচলে মুছিতেছে। শ্যামল বলিল—তোমাকে আমি দুঃখ দিলাম মা। আজ তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আর কখনো আমি আমার পিতৃপরিচয় জানতে চাইব না। তুমি কেঁদো না মা। আমার পরিচয়েই তোমার পরিচয় হবে। এমন যেন আমি হতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।

পদ্মা শ্যামলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবা, তাই যেন হয়।

শ্যামল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—আর কোনদিন সে পিতৃপরিচয় জানিতে চাহিবে না।

রাজীবের কলিকাতার বাড়ী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। একটা বড় ঘড়িতে দেখা যাইতেছে সাতটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট। ঘরখানারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাপের প্রত্যেকটি শো-কেশের উপর বড় বড় হরফে লেখা—ভারতীয়—বাংলা, ভারতীয়—মধ্যপ্রদেশ, ভারতীয়—দক্ষিণ প্রদেশ, ভারতীয়—সাঁওতাল পরগণা, ভারতীয়—আসাম—ইত্যাদি। আবার কতকগুলিতে লেখা—চীন, জাপান, তিব্বত, মালয়, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা—ইত্যাদি। প্রত্যেক দেশের সাপ ও তাহার কঙ্কাল সেই দেশের লেবেল মারা আলমারীতে রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সাপ যেভাবে স্বাধীন জীবনে জীবন্ত অবস্থায় থাকে—যথাসম্ভব তাহার অনুকরণও ঐ ক্ষুদ্রস্থানে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় টেবিলের যন্ত্রগুলি মাজাঘষা, ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সোফা ও চেয়ারে সুন্দর সিল্কের আচ্ছাদন পড়িয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে টিপয় এবং টবসমেত ছোট ফুলের গাছ। রাজীবের বসিবার চেয়ারটায় একটা ভালক্যুশন এবং সম্মুখে বড় ফুলদানীতে একগুচ্ছ ফুল।

সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে ভদ্রার মৃন্ময়ী মূর্তিটির। উঁচু বেদীর উপর সেটি বসানো হইয়াছে; কোন সময়েই আর আবৃত থাকে না। মূর্তিটি ঘিরিয়া কয়েকটি ফুলের টব পিতলের পাত্রে রক্ষিত হইয়াছে। মীনা কতকগুলি ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে—

www.boiRboi.blogspot.com

গান

আমি সন্ধ্যালগনে আপনার মনে
গেঁথেছি মালা, গেঁথেছি মালা।
আকাশের আলো নিবে এলো ধীরে
এই নিরালা—এই নিরালা।

অকস্মাৎ শ্যামল ঢুকিয়া জুতার শব্দ করিল।

মীনু যেন শুনিতে পায় নাই। গান গাহিতেছে—

দলে দলে খেলে সোহাগ-সুবাস
কাজ হারা বুকে জাগে অবকাশ—
হতাশা ঢালা—নিরাশা ঢালা····

শ্যামল পুনরায় শব্দ করিল।

মীনু গাহিয়া চলিয়াছে।

শ্যামল সুর করিয়া বলিল—ওরে ও কালা—কানে কি তালা?

শ্যামল চেয়ারের পিছনে গিয়া হাত দিল।

মীনু বলিল—ও মা কি জ্বালা! বড্ড ইয়ে আপনি যান।

—মিললো না—মিল হলো না, বুদ্ধির ছালা—!

মীনু অকস্মাৎ কৃত্রিম ভয়ে বলিল—স্যার আসছেন—পালা রে পালা।

—কৈ? কোথায়?

শ্যামল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা টুলে বসিয়া পড়িল সুবোধ ছাত্রের মত।

—হিঃ হিঃ হিঃ—কেমন জব্দ! মাগো—কি ভীতু আপনি! স্যারের ভয়ে পিঁপড়ের গর্ত খোঁজেন।

—ভয় করিনে—ভক্তি করি! ভয় আমি কাউকে করিনে!

—আমাকে?

—ওহো থুড়ি, তোমায়—খুবই ভয় করি।

—যাঃ—খোসামুদে কোথাকার!

—না লক্ষ্মীটি, সত্যি ভয় করে তোমায়—বিশ্বাস করো!

শ্যামল মীনুর আঁচলটা ধরিল।

—এই যাঃ, ছুঁয়ে দিলেন যে! এখনো মার গলায় মালা দিইনি; যাই—আবার কাপড় ছাড়তে হবে।

—আমি কি অভাজন যে ছুঁলেই জাত যাবে?

—অভাজনদের ছুঁলে মোটেই আমার জাত যায় না, আপনি অপবিত্র।

www.boiRboi.blogspot.com

—কেন ?

—কারণ আপনি শুধু শ্যামল। ওর আগে, একটা শ্রীও নেই—পরে একটা বিশ্রী কিছুও নেই। কিন্তু ছাড়ুন—কাপড় ছাড়বো—মার গলায় মালা দিতে হবে।

পথ আগলাইয়া শ্যামল বলিল—পরে বিশ্রী কিছু তুমি জুড়ে দিও মীনু, আগে কিন্তু আমি একটা শ্রী জুড়ে নেব।

—কি রকম করে ?

—মীনা করে !

—যাঃ—ফের দুষ্টুমী ! কে-ওখানে ?

বাহিরে একটি মনুষ্যমূর্তির ছায়া নড়িয়া উঠিল। ধীরে ধীরে ঢুকিলেন রায় রামেশ্বর রায়বাহাদুর।

রামেশ্বর বলিলেন—এ ভালোই হয়েছে মা মীনু ? সুখে থাকো। আমি আজই চলে যাচ্ছি। রায় বাড়ীর দরজা তোমার কাছে খোলাই রইল—যখন ইচ্ছে, যেও। রামেশ্বর-রায়ের সর্বস্ব তোমারই থাকবে।

অকস্মাৎ এই কথা শুনিয়া খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া মীনু বলিল—কী সব বলছো তুমি বাবা ! চলো, আমি তোমার সঙ্গেই ফিরে যাবো। এখানে আসার জন্য আমার অপরাধ নিও না বাবা, আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। আমি জানি, তুমিই আমার বাবা। আমায় ভুল বুঝো না বাবা—আমি তোমাকেই আমার বাবা বলে জানবো। এ বিশ্বাস আমার ভেঙে দিও না তুমি।

মীনু রামেশ্বরের পায়ে ধরিল।

—ওঠ মা, তোর বাবা আমি নই। তবে পিতা অর্থে যদি প্রতিপালক হয়, তাহলে আমি হয় তো—কিন্তু থাক সে কথা ! আসবার ইচ্ছে ছিলো না এখানে, কিন্তু লোভ সামলাতে পারলাম না তোকে আর একবার দেখবার ! তোর এই অভাগা পিতাকে যদি ক্ষমা করতে পারিস মীনু—তোর মাতৃহন্তা, তোর জন্মদাতার, মহাশত্রুকে যদি কোনদিন—

ত্বরিতে মীনু বলিল—থামো, বাবা থামো ! আমি সইতে পারছি নে। আমি তোমার কাছে যে অগাধ স্নেহ পেয়েছি—তাই আমার সারা জীবন দিয়ে অনুভব করবো বাবা ? তুমিই আমার বাবা—তুমিই—বাবা আমার !

—আচ্ছা মা, আশীর্বাদ করি, সুখী হ'। রাজীব তোকে এখন ছাড়বে না। থাক কিছুদিন। আমি আসবো আবার। তোকে নিয়ে যাব····

রামেশ্বর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজীব প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—যেও না হে রামেশ্বর—দাঁড়াও !

www.boiRboi.blogspot.com

—থাক—রাজীব। দুর্ভাগাকে বিদ্রূপ করা তোমার মত মহান্ ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশা করিনে।

—দুর্ভাগা তুমি নও রামেশ্বর। তুমিই চির-বিজয়ী হয়ে রইলে ভাগ্যদেবী চিরদিনই তোমার অনুকূলে। নইলে ভদ্রা যাকে চোখের কোণেও দেখেনি, ভদ্রার মেয়ে তারই পুত্রকে আত্মদান করবে কেন?

—ও কথা থাক রাজীব। ভদ্রার মেয়ের উপর পিতার অধিকার তুমি গ্রহণ কর—আমি নিঃসন্তানই থাকতে চাই।

—সন্তান থাকতেও।

—না। সন্তান আছে বলে স্বীকার করিনে আমি আর।

শ্যামল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। বিস্মিত সে কম হয় নাই। রাজীব তাহাকে বলিলেন—শ্যামল—রায় বাহাদুর রামেশ্বর রায় তোমার জন্মদাতা পিতা প্রণাম কর।

—না—না রাজীব—না। আমি অপুত্রক—আমি অন্য কারো বাবা নই। আমার মীনুই রইল—যদি বাবা কারো হই তো ঐ মীনুর। না, আর কারো বাবা হবার যোগ্য নই আমি। আমি ব্যভিচারী লম্পট····

রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছেন। শ্যামল পথ আগুলিয়া পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিল —বাবা। এই মুহূর্তে জানলাম আপনিই আমার জন্মদাতা পিতা।

—না-না-না—আমি ব্যভিচারী, লম্পট, শয়তান—যাও—

—হোন, তাতে আমার কি। আমার তো বাবা।

রামেশ্বর ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ যেন স্নেহের সমুদ্র তাঁহার অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। হিমালয় গলিয়া পড়িতেছে নাকি। তথাপি কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন—ছাড়ো। পথ ছাড়ো হে ছোকরা—ছাড়ো।

শ্যামল তাঁহার পায়ের উপর দু'হাত রাখিয়া বলিল—কে আপনি—কি আপনি—আমার জানবার আর কিছুই দরকার নেই বাবা, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার নেই আমার। আমি আজ জানলাম আপনি আমার বাবা—এই আমার সৌভাগ্য। আমাকে স্বীকার না করেন ক্ষতি নেই। আমি স্বীকার করতে তো বাধ্য—বাবা—আপন জন্মদাতাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আপনার যদি অসুবিধা হয়, থাক্। আমার পিতৃ-পরিচয় গোপনই থাকবে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক থাকেন—আমিও তাদের একজন হয়ে রইলাম। তবু আজ জানলাম আমার বাবা রামেশ্বর রায়। এই আমার সৌভাগ্য। যান—আর কিছু আমার বলবার নেই··· প্রণাম।

শ্যামল পথ ছাড়িয়া দিল। রামেশ্বর চলিয়া যাইতেছিলেন—অকস্মাৎ

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরিয়া আসিলেন। ছুটিয়া গিয়া মীনুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং রাজীবকে বলিলেন—আমার ছেলে নেই—মেয়ে আছে রাজীব! ছেলে তোমার।

তুমিই তার বাপের কাজ করেছ। রাজীব, শীগ্‌গির আয়োজন কর—আমার মেয়ে মীনুর সঙ্গে তোমার ছেলে শ্যামলের বিয়ে। খুব শীগ্‌গির—হ্যাঁ, আমি বুঝেছি রাজীব—বুঝেছি, পৃথিবীতে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, শুধু আছে নয়—জীবন্ত, জাগ্রত, মূর্ত হয়ে আছে, বজ্রের চেয়ে কঠোর হয়ে আছে—নিয়তির চেয়ে নিষ্ঠুর হয়ে আছে। রাজীব! কথা বলছো না যে? আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে কি হতে পারে না রাজীব?

—তুমিই জিতলে হে রামেশ্বর—তুমিই জিতে গেলে।

রাজীব ধীরে ধীরে মীনুর গাঁথা মালাটি ভদ্রার গলায় পরাইয়া দিলেন এবং পদ প্রান্তে মালা রাখিয়া বলিলেন—মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব চরণ দিলাম রাঙায়ে—।

www.boiRboi.blogspot.com